ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০*

মো. জুলকারনাইন
অমিত সরকার
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

*পরিমার্জিত সংস্করণ, ২৯ নভেম্বর ২০২০

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
অমিত সরকার, এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যাংক পরিচালক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী ও সাংবাদিকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা, তথ্য ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ৩

১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট ৩

১.২ গবেষণা যৌক্তিকতা ৪

১.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য ও পরিধি ৫

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৫

১.৫ গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা ৭

২.১ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি ও এর কারণ ৭

২.২ ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ ৯

২.২.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা ৯

২.২.২ তদারকি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ১১

২.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সূচকসমূহ ১১

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা ১২

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি স্বাধীনতায় বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ ১৮

ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র ১৮

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ ২০

৪.১ আইন ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ২০

৪.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতায় বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ: আইন ও নীতি দখল ২৪

৪.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতায় বাহ্যিক প্রভাব/হস্তক্ষেপ: ব্যাংক খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ২৫

৪.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ৩১

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ৩৩

৫.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি ৩৩

৫.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি ৩৩

৫.৩ তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ৩৬

৫.৪ তদারকি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৪০

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৪০

৬.২ সুপারিশ ৪০

পরিশিষ্ট: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৪২

মুখবন্ধ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঞ্জিভূত করে সফলভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তর করে দেশের পুঁজি বাজারকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ একটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনগণের আমানতকৃত অর্থ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও এই সঞ্চিত আমানতের ওপর জনগণের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জনগণের পক্ষ থেকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান জনগণের আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুসারে মুদ্রানীতি প্রণয়ন, বৈদেশিক বিনিময় নীতি প্রণয়ন, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ, ব্যাংক নোট ইস্যু, পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা পাচার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের সংখ্যা ও এর শাখার সংখ্যা, এবং আমানত ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বিস্তার লাভ করেছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্বালানি, পরিবহন ইত্যাদি খাতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ব্যাংকিং খাতে চলমান অস্থিরতা ও নৈরাজ্য তথা অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, মূলধনের অপর্যাপ্ততা, উচ্চ সুদের হার, তারল্য সংকট ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত হয়। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি হওয়ার মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনাসমূহ ব্যাংকিং খাত বিশেষত খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান গবেষণাটি টিআইবি'র এই কার্যক্রমের অংশ। ব্যাংকিং খাতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও গণমাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে আসলেও বিশেষতঃ খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার অভাব রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং খাতের তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

সুশাসনের পাঁচটি সূচকের আলোকে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, ব্যবসায়ীদের প্রভাবে ব্যাংক তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব, আইনগত সীমাবদ্ধতা, তদারকি কার্যক্রমে সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্বৃত্তায়ন এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব করছে এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে যা এমনকি নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকেও খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। খেলাপি ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও বিদেশে পাচার হচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাকে ব্যাহত করছে। তবে ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত কিছু সংস্কার ও তার কার্যকর প্রয়োগ ব্যাংকিং খাতের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি হতে উত্তরণে সহায়ক হবে।

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. জুলকারনাইন, অমিত সরকার এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া টিআইবি'র অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা, তথ্য ও গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যাংক পরিচালক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ খেলাপি ঋণকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং খাতে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন তথা ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম দূরীকরণে ও সুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট

ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি দেশের অর্থনীতি সেই দেশের শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঞ্জিভুত করে সেটাকে সফলভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তর করার মাধ্যমে একটি দেশের পুঁজি বাজারকে শক্তিশালী করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের আমানতকৃত অর্থের দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু ব্যাংকসমূহের মালিকানা প্রকৃতপক্ষে জনগণের হলেও সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তার ওপর তাদের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত দিনকে দিন এর কলেবর বৃদ্ধি করছে। ব্যাংকের সংখ্যা ও এর শাখার সংখ্যা এবং সঞ্চয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বিস্তার লাভ করেছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্বালানী, পরিবহন ইত্যাদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ৩টি বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংক নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০টি তফসিলি ব্যাংক (৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত, ৩টি বিশেষায়িত, ৯টি বিদেশী ব্যাংক এবং ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যার মধ্যে ৩৪টি প্রথাগত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৮টি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক) এবং পাঁচটি অতফসিলি ব্যাংক রয়েছে।[১] ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল মোট ১০ হাজার ১১৪ টি (গ্রাম-৪৮৯০টি ও শহর-৫২২৪টি)।[২] ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ১০ হাজার ৩৬৬.৪ বিলিয়ন টাকা এবং প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ আট হাজার ৪৭০.২ বিলিয়ন টাকা (জুন, ২০১৮)।[৩]

বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, বৈদেশিক বিনিময় বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বা অর্থ বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান, বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক নোট ইস্যু, পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা পাচার ইত্যাদি।[৪] ব্যাংকিং কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ বাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ আইন দুইটি বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যাংকিং কোম্পানীসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষমতা প্রদান করেছে। ব্যাংকসমূহ জনগণের আমানতের অর্থ ব্যবসায়ী বা উদ্যোগীদের হাতে ঋণ হিসেবে তুলে দেয়। সঠিক প্রক্রিয়ায় এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত দিনকে দিন বিস্তার লাভ করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও গত এক দশকে ব্যাংকিং খাতে চলমান অস্থিরতা ও নৈরাজ্য তথা অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, মূলধনের অপর্যাপ্ততা, উচ্চ সুদের হার, তারল্য সংকট ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত হয়। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও ২০১২ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে খেলাপি ঋণের হার পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই খেলাপি ঋণসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত ও ব্যবসা সংকটজনিত নয়। বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও তার যথাযথ কার্যকর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি বরং ঋণ খেলাপিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান ও খেলাপি ঋণ কম দেখাতে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। গত এক দশকে ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি ও খেলাপি ঋণের উচ্চ হার রোধ করতে না পারা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের কার্যকরতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

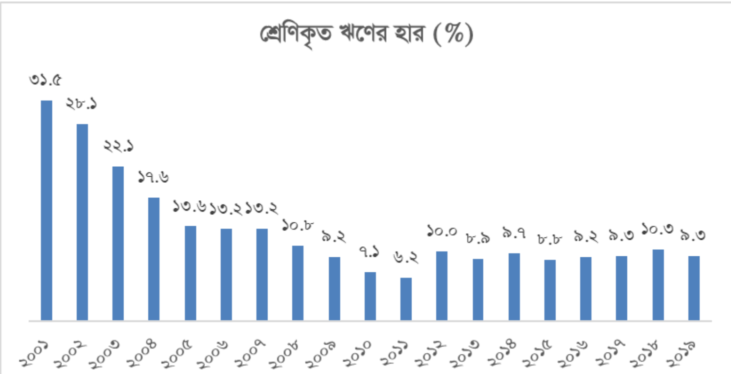

---

[১] বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সংগৃহিত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

[২] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮, ওয়েবসাইট থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংগৃহিত, পৃষ্ঠা:২৮০ বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/pub/publictn.php

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭ এ

১.২ গবেষণা যৌক্তিকতা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়, ২০১০-২০১৫ সালের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের অস্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধির কারণে সরকারকে বাধ্য হয়েই ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে মোট ৭৫ বিলিয়নের অধিক পরিমাণ টাকা পুনঃমূলধন হিসেবে যোগান দিতে হয়েছিল। একটি স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য স্বচ্ছ ব্যাংকিং খাত আবশ্যক এবং বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণকল্পে সরকারের জন্য অতি জরুরি ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন। এজন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সরকারি ব্যাংকসমূহের তদারকি, মোট খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান বৃদ্ধির জন্য কার্যাবলি গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এসকল ক্ষেত্রে বলা হয়, একটি অপরিহার্য মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর ও স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ইস্যুসহ সরকার কী পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিতে চায় তা পর্যালোচনা করবে। যাতে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা তার প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, কার্যকারিতা শক্তিশালী করা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ২০০৯-২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধে বিচক্ষণ কর্মব্যবস্থা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। এতে আরও বলা হয়, বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণসহ সরকারি ব্যাংকগুলোর দুর্বল কর্মসম্পাদন ব্যাংকিং খাতের সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এজন্য সরকারি ব্যাংকগুলোর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার একটি কৌশল প্রণয়ন করবে এবং চিহ্নিত ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া, এধরনের ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে/তত্ত্বাবধানে আনা হবে এবং সব ধরনের আর্থিক নিয়মাচার মেনে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। সরকার নিশ্চিত করবে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট খেলাপি ঋণ যেন দশ শতাংশ অতিক্রম না করে। এসকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্ব স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হবে। নিয়ন্ত্রকেরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের কার্যক্রম এবং ক্ষমতা ব্যবহারে দায়বদ্ধ থাকে সেজন্য সরকার তাদের সমর্থন করবে। নিয়ন্ত্রকদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও পর্যাপ্ত সম্পদসহ সক্ষম করে তোলা হবে যাতে তারা তাদের কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পাদনসহ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।[৫]

২০২১ সালের মধ্যে (রূপকল্প ২০২১) বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় দেশে সুশাসনের ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি মৌলিক নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- আইনের শাসন নিশ্চিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, উন্নত সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি খাতকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দক্ষ করে তোলা। রূপকল্প ২০২১ অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত অন্যতম বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বেসরকারি খাতের যথাযথ ও সহায়ক তদরকির জন্য বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার যথাযথ সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়, পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৬]

এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এই অভীষ্টের লক্ষমাত্রাগুলোর মধ্যে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (লক্ষমাত্রা ১৬.৬) এবং সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস (লক্ষমাত্রা ১৬.৫) করার কথা বলা হয়েছে।[৭]

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান গবেষণাটি টিআইবি'র এই অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ। সমগ্র ব্যাংকিং তথা বাংলাদেশের অর্থখাতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকিং খাত বিশেষ ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও গণমাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে আসলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি বিষয়ে নিবিড় গবেষণার অভাব রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। খেলাপি ঋণকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং খাতে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন তথা ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম দূরীকরণে ও সুশাসন

[৫] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-১৪১-১৬৫, বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/site/files/d40d434b-5afa-48ec-854b-6ce391c466d6/

[৬] প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২ বিস্তারিত দেখুন: http://plancomm.portal.gov.bd/

[৭] টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, বিস্তারিত দেখুন: http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3acbc97e_6ba3_467b_bdb2_cfb3cbbf059f/SDGs%20Bangla%20Book_Final.pdf

বাস্তবায়নে কার্যকর নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সুসংহত করতে পারলে এই খাতের সুষ্ঠু পরিবেশ ও টেকসই স্থিতিশীলতা যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

১.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে-

- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা
- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

এই গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা পর্যালোচনা করে সুশাসনের বিভিন্ন সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিদ্যমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকগুলোর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তাদরকি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো, এ সংশ্লিষ্ট তদারকি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। যার মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নীতি ও প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, অফসাইট তদারকি, ঋণ তথ্য পর্যালোচনা, অনসাইট তদারকি, সমন্বিত তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকাও (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংক এসোসিয়েশনসমূহ, ব্যবসায়ী, ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০১০ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় ও তথ্যদাতার ধরনভেদে পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে যাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ব্যাংক পরিচালক, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক অন্যতম। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক দলিল ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।

১.৫ গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো

পরোক্ষ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যাংকিং কার্যক্রমে বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়। যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক প্রভাব ও আইনগত সীমাবদ্ধতা, তদারকি সক্ষমতার ঘাটতি এবং তদারকি কাজে সুশাসনের ঘাটতি। এসকল বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে এবং ব্যাংকিং বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই সূচক এবং এর উপসূচকসমূহের আলোকে এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী ১: বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসন নির্দেশক	উপ-নির্দেশক/ক্ষেত্রসমূহ
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা	**আইনি কাঠামো:** প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির স্বাধীনতা, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা, নীতি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
	বাহ্যিক প্রভাবক: আইন ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গঠন, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা
তদারকি সক্ষমতা	নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, দায়িত্ব/ক্ষমতা অর্পণ, তদারকি কৌশল (অফসাইট ও অনসাইট তদারকি) এবং জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা

সুশাসন নির্দেশক	উপ-নির্দেশক/ক্ষেত্রসমূহ
স্বচ্ছতা	ব্যাংকিং প্রতিবেদন, নীতি প্রণয়নের ব্যাখ্যা, সভার কার্যবিবরণী ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহিতা	পরিচালনা পর্ষদ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ	তদারকি কাজে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র, কারণ, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন

দ্বিতীয় অধ্যায়:
পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ব্যাংকিং কাঠামোতে ব্যাংকিং খাত তদারকি কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। একটি দেশের আর্থিক খাত স্থিতিশীল রাখতে ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা এবং বিধি-বিধান প্রতিপালনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বা ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও উল্লিখিত গবেষণা ও প্রবন্ধসমূহে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান সমস্যার কারণ হিসেবে খুব সীমিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ সামনে আসে। গবেষণা, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনসমূহে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান সমস্যা বিশেষত উচ্চ হারের খেলাপি ঋণের বেশ কিছু কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি ও এর কারণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশের ৪১ টি ব্যাংকের ৭৫টি শাখায় এবং ৫৭৪ জন ঋণ গ্রহীতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে একটি গবেষণা সম্পন্ন করে। দেশের খেলাপি ঋণ ও জামানতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, খেলাপি ঋণ ও অপর্যাপ্ত জামানতের মধ্যেকার সম্পর্ক পর্যালোচনা এবং বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। এই গবেষণায় খেলাপি ঋণের কারণ হিসেবে বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দিক থেকে যে সকল বিষয়ের কারণে ঋণ খেলাপি হয়, তার মধ্যে উচ্চ সুদহার, অদৃশ্য মাশুল ও অন্যান্য সার্ভিস চার্জের কারণে উচ্চ হারের কিস্তি, সঠিক সময়ে ঋণ দিতে না পারা, ব্যবসায় ক্ষতি হলেও ঋণের সময়কাল বৃদ্ধি না করা ও নতুন ঋণ না দেওয়া, ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান, ঋণের টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা পরিবীক্ষণ না করা, ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের চাপে যথাযথভাবে যাচাই না করেই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান এবং ব্যাংকারদের দুর্নীতির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঋণ গ্রহীতার দিক থেকে কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কিছু ব্যক্তি ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি, যাদের উদ্দেশ্যই থাকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া, এক উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে ভিন্ন খাতে সরিয়ে ফেলা, আর্থিক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব এবং ঋণ নিয়ে ব্যবসা না করে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা ইত্যাদি। ঋণের বিপরীতে অপর্যাপ্ত জামানত গ্রহণের ফলে ঋণ ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার বাধ্যবাধকতা কমে যাওয়া, ব্যাংকের অধীনে থাকা জামানত বিশেষত বড় জামানত ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহ কম থাকা, সম্পদ মূল্যায়ন সংস্থা কর্তৃক সম্পদের অতিমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণেও ঋণ খেলাপি হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেকার অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপকদের অতিমাত্রায় ঋণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দেয় যা আগ্রাসী ও বিবেকবর্জিত ব্যাংকিং এর দিকে চালিত করে এবং খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি করে। সরকারের নীতি, আইনগত জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণেও খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে আদালত হতে বারবার স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা এবং তা বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। এই গবেষণায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি দুর্বলতা উদঘাটন না হলেও সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। কোনো নীতি প্রণয়নের পূর্বে এর প্রভাব কী হতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তা গবেষণার মাধ্যমে দেখা উচিত, যাতে বারবার নীতি পরিবর্তন করতে না হয়। ব্যাংক ভিত্তিক ঋণপুনঃতফসিলের অবস্থা জানতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিস্তারিত ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ রিপোর্টিং সিস্টেম থাকা উচিত। একক বৃহত্তম ঋণ সীমা নীতিমালায় একক বৃহত্তম ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ২৫% এর বেশী ঋণ প্রদানে যে ব্যতিক্রমগুলো রাখা হয়েছে তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বর্তমানে ৫৬টি ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।[৮]

অপর একটি গবেষণায় ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ, ব্যাংকসমূহের দূর্বল ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ, স্বাধীনতায় ঘাটতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আইনগত বাধা, তথ্যের ঘাটতির কারণে তদারকি সংস্থা কর্তৃক দায়ী ব্যাংককে অব্যাহতি প্রদান, অনিয়ন্ত্রিত বাজার শৃঙ্খলা, ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দেশে বা বৈদেশিক কার্যক্রমে সমানভাবে প্রবিধান মেনে চলা হচ্ছে কিনা এবং ব্যাংকিং খাতের উপর অ-আর্থিক কার্যক্রমের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলো সার্বিকভাবে তদারকি না করা ইত্যাদি। এ গবেষণায় ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। খেলাপি ঋণ হ্রাস বিশেষত বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ বৃদ্ধি, রিটার্ন অন ইক্যুইটি ও রিটার্ন অন এসেট বৃদ্ধি, আয়-ব্যয় অনুপাত হ্রাস, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যাজনক ব্যাংকের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংকের তাদরকি কার্যক্রমের কার্যকরতাকে নির্দেশ করে। তবে ব্যাংকিং খাত সার্বিকভাবে সকল দিক থেকে উন্নতি করেছে এমন জোর দাবি করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয় এবং এই গবেষণায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে সীমিতভাবে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়, যেমন, ব্যাংকসমূহ তাদরকির ক্ষেত্রে এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখার

---

[৮] Md. Abdul Awwal Sarker et el. "Field Survey Report of Study on Credit Risk arising in the Banks from Loans Sanctioned against Inadequate Collateral", Bangladesh Bank, 29 August 2017

সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগের জনবল ঘাটতি, এবং ব্যাংক তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি ইত্যাদি।[৯]

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের একটি গবেষণায় ব্যাংকিং শিল্প বর্তমানে যে ধরনের চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখি হচ্ছে বিশেষত হলমার্ক ঘটনার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যাংকিং খাতের পারফর্মেন্স, এই খাতের প্রধান প্রধান সংস্কার, হলমার্ক ঘটনার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণায় হলমার্ক ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয় তার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির অনুপস্থিতি, ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালনা পর্ষদ গঠন, ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং উচ্চ পর্যায়ের নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতির অনুপস্থিতি, স্বয়ংক্রিয় এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি। এছাড়া বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।[১০]

বিগত এক দশকে ব্যাংকিং খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ পুনর্মূল্যায়ন এবং সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সিপিডি'র অপর একটি গবেষণায় ব্যাংকিং খাতের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাসেল ৩ অনুসারে ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণে ব্যর্থতা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে উচ্চ হারের খেলাপি ঋণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে আয়-ব্যয় অনুপাতের উচ্চ হার যা উক্ত ব্যাংকসমূহের দূর্বল ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। এছাড়া গত দশ বছরে ঋণ-আমানত অনুপাত হারের উঠা-নামা কিছু ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অদক্ষতাকে নির্দেশ করে। বিশেষ করে চতুর্থ প্রজন্মের নতুন ব্যাংকসমূহে তারল্য সংকট লক্ষণীয়। এই গবেষণায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বেসিক ব্যাংক, হলমার্ক, এননটেক্স, ক্রিসেন্ট লেদার, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, ফার্মার্স ব্যাংক ইত্যাদি ১০ টি কেলেঙ্কারী ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাত থেকে ২২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এই গবেষণায় ব্যাংকিং খাতের স্বজনপ্রীতি ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় যা এই খাতের সুশাসনের অবনতি ঘটায়। দেশের পুঁজি কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যারা অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে। একটি ব্যাংকে একক পরিবারের দুই জন সদস্যের পরিবর্তে চার জন পরিচালক রাখা এবং পরিচালকের মেয়াদ নয় বছর করা; আইনের এই দুইটি সংশোধন ব্যাংকিং খাতের সুশাসনকে ব্যাহত করে। ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া ব্যাংকিং খাতের সুশাসনকে স্বজনতোষি পুঁজিবাদের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করে। যার উদাহরণ হচ্ছে, একটি কোম্পানী কর্তৃক সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কতা সত্ত্বেও দুইটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একই পরিবারের চারজনের অধিক সদস্য পরিচালক হিসেবে থাকা। ব্যাংকের চাহিদা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদানের এক্তিয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়টি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স পাওয়াটা জনগনের টাকা আত্মসাতের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শতকরা ৯৫ শতাংশ ব্যাংকাররা মনে করছে চতুর্থ প্রজন্মের নতুন ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।[১১]

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় খেলাপি ঋণের প্রতিকার হিসেবে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় তার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের ঋণ প্রদানে প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং ব্যাংকে কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক বিবেচনা পরিহার করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার এখতিয়ার প্রদান এবং পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জবাবদিহিতা করবে তার ব্যবস্থা করা, বিদ্যমান দেউলিয়া আইন সংশোধন করা, সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিদ্যমান ব্যাংকিং বিধি-বিধানের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা, আইনের লজ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা, নিরাপদ জামানত নিশ্চিত করতে দক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ এবং জামানত বিষয়ক ডাটাবেজ তৈরি করা, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ সংকুচিত, অবসায়ন বা একীভূত করা।[১২]

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল চুক্তির অনুচ্ছেদ ৪ (Articles of Agreement) অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বা পরামর্শের পর আইএমএফ তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অবস্থার ক্রমাবনতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয় বাংলাদেশে প্রকাশিত খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতের প্রকৃত চিত্র অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদ দিয়ে যাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি অনুযায়ী যে সকল ঋণ গ্রহীতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না শুধমাত্র এমন খেলাপি ঋণ পুনর্গঠন ও পুনঃতফসিল করা হয়। বর্তমানে খেলাপি ঋণ, পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণ একসাথে ২০ শতাংশেরও বেশি। এর পাশাপাশি আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণও রয়েছে যা খেলাপি

[৯] Imtiaz Ahmad Masum, An Anatomy of Central Bank's Supervisory Functions with Special Reference to Bangladesh Bank, Asian Institute of Technology School of Management, Thailand, May 2012

[10] Fahmida Khatun, State Governance in the Banking Sector; dealing with the recent shocks, State of the Bangladesh Economy in FY 2011-2012, CPD, 2012

[১১] Fahmida Khatun, Banking sector in Bangladesh: Moving from Diagnosis to Action, CPD

[১২] Barun Kumar Dey, Managing Nonperforming Loans in Bangladesh, Asian Development Bank, 2019

ঋণ হিসেবে দেখানো হয় না। ব্যাংকিং খাতের এই চিত্র ব্যাংকসমুহের নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চর্চার লঙ্ঘনকে নির্দেশ করে। আইএমএফ এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণে ব্যাংকিং বিধি-বিধান বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক সংস্কার, ঋণ পুনর্গঠন ও পুনঃতফসিলের নির্ণনায়ক মানদণ্ড আরও কঠোর করা, ব্যাংকের কর্পোরেট গভর্নেন্স শক্তিশালী করা, ঋণের কেন্দ্রীভবনকে সীমিত করা, যোগ্যতা ও উপযুক্তার মানদণ্ড পালনে বাধ্য করা ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করা, এবং খেলাপি ঋণ আদায়ের আইন শক্তিশালী করা বিশেষত ইচ্ছেকৃত খেলাপির ক্ষেত্রে, আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ব্যাংকসমূহকে রেহাই দেওয়ার প্রবণতা পরিহার করে ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানানো হয়। এখানে বলা হয় কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন।[১৩]

২.২ ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণা ও প্রবন্ধে ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.২.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রবন্ধে বলা হয় মুদ্রানীতি প্রণয়ন ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু সম্প্রসারিত এখতিয়ার যা সমগ্র অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে সেসকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপি বিতর্কের সূচনা করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর অযাচিত প্রভাব বিস্তারের বিষয়সমূহ বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাজে দুই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি দেখা যায়-

রাজনৈতিক দখলের ঝুঁকি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার; যেমন, নির্বাহী পরিষদ বা আইনসভার কোনো সদস্য কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিল তছরূপ করা। অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার; যেমন, স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক অর্জনের জন্য নিজস্ব বিচার বিবেচনার বাইরে গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কোনো নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ। রাজনৈতিক প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে নীতি বিকৃতি হওয়া এবং জনগণের আস্থা নষ্ট হওয়া।

শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখলের ঝুঁকি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিন ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে; এক, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (কোনো গোপনীয় তথ্য থেকে সুবিধা আদায়); দুই, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে মুদ্রানীতি প্রণয়নের জন্য প্রভাব বিস্তার; তিন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রভাব বিস্তার। ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অতিরিক্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেওয়ার ফলে শেষোক্ত দুর্নীতির ঝুঁকি ২০০৮ সাল থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। [১৪]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাব থেকে স্বাধীন রাখার জন্য নানা ধরনের আইনকানুন করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করারও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেশে ও বিদেশের গবেষণা ও প্রবন্ধসমূহে আলোচনা করা হয়েছে।

যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এখতিয়ারভুক্ত অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের বিষয়সমূহ নির্ধারণ করতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে সেখানে রাজনৈতিক ও বেসরকারি প্রভাব দমন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গঠনতন্ত্র এবং প্রাসঙ্গিক আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য অংশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত স্বাধীনতা, ভারসাম্যপূর্ণভাবে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া, মেয়াদ পূর্ণ করার নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। [১৫]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা কার্যকর ফলাফল নিয়ে আসে। কার্যকর তদারকির জন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। রাজনৈতিক চাপ থেকে রক্ষা পেতে এবং যথাযথভাবে তদারকি কার্যক্রম সম্পাদন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুস্পষ্টভাবে কর্তৃত্ব প্রদান, আইনগত সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক সমর্থন দেওয়া প্রয়োজন। তবে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার অর্থ ভিন্নভাবে প্রকাশ হতে পারে। তদারকি কর্তৃপক্ষের কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োজন এবং এই ক্ষমতার কার্যকারিতা কিভাবে সীমিত হয় বা কখনও বিপরীতভাবে কাজ করে তা তিনটি প্রধান বিষয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়; তদারকি কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে যখনই ধরা পড়বে যে কোনো ব্যাংকের সামর্থ্যের মাত্রায় অবনতি হয়েছে তখনই তার বিরুদ্ধে ত্বড়িৎ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অবশ্যই তদারকি কর্তৃপক্ষের থাকতে হবে; দুই, ব্যাংক কর্তৃক আইন ও বিধি-

---

[১৩] IMF, Press Release on Article IV Consultation with Bangladesh, 2019, বিস্তারিত দেখুন: (https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/17/Bangladesh-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48682)

[১৪] Abigail J. Marcus, Central bank governance and the prevention and detection of corruption, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, Date: 4 April 2019, source: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Central-bank-governance-2019_PR.pdf

[১৫] Abigail J. Marcus, 2019, প্রাগুক্ত

বিধান লঙ্ঘন বা ব্যাংকের হঠকারী আচরণের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের এই বিষয়টি চিহ্নিত করার স্বাধীন সক্ষমতা থাকতে হবে; তিন, আদালতের অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই তদারকি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা থাকতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষমতা, তদারকি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবশ্য পালনীয় তথ্য উন্মোচন/প্রকাশের মাত্রা, এবং তদারকি কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা এই তিনটি বিষয় তদারকি কাজের কার্যকারিতাকে নির্দেশ করে।[১৬]

তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতায় ঘাটতি আর্থিক সংকটের আরও অবনতি ঘটায়। কোরিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তদারকি করে থাকে এবং অর্থমন্ত্রণালয় বিশেষায়িত এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তদারকি করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের দুর্বল তদারকি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অত্যাধিক ঝুঁকি নিতে উৎসাহী করে, যা কোরিয়ায় ১৯৯৭ সালের সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষত সুহার্তো পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে দুর্বলভাবে আইন প্রয়োগ এবং উক্ত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠানের অনীহা ইন্দোনেশিয়ার ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের শিল্প গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ তদারকি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করে থাকে। জনগণের স্বার্থ না দেখে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় কমাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধি-বিধান প্রণয়ন বা অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ শিথিল করা। এক্ষেত্রেও তদারকি প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মতো করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণও তদারকি কার্যক্রমের কার্যকারিতার অবনতি ঘটায়। তবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। কখনও কখনও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক মতের বিপরীতে চলে যেতে পারে। একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান একটি দেশের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভারসাম্য রাখার জন্য প্রচলিত সরকারের তিনটি শাখার (নির্বাহী, আইনসভা ও বিচারবিভাগ) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। একে সরকারের 'চতুর্থ শাখা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাজনীতি থেকে স্বাধীনতা, শিল্পগ্রুপ থেকে স্বাধীনতা এবং একই সাথে প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা থাকা, এই তিনটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়। তবে আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে রাজনীতি থেকে স্বাধীনতার বিষয়টি প্রধান উদ্বেগের বিষয়।[১৭]

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটি কার্যপত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের চার মাত্রার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে[১৮]-

নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা (Regulatory Independence): ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধান/প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন নির্ধারণের স্বাধীনতা (মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত, ঋণ সীমা, নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিধি-বিধান)। যদি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান এই বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিতে সক্ষম হয় তাহলে তারা এই বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বেশি উৎসাহিত হয়। রাজনৈতিক চাপের কারণে তৈরি হওয়া জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া পরিহার করে এই ধরনের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক বাজারের যেকোন ধরনের পরিবর্তশীল পরিস্থিতিতে অতি দ্রুততার সাথে বিধানসমূহ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

তদারকি স্বাধীনতা (Supervisory Independence): রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বাঁচতে তদারকি প্রতিষ্ঠানকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান, এবং তদারকি কাজে সততা নিশ্চিত করতে আর্থিক সুবিধা প্রদান যা দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য আকর্ষণ করে এবং ঘুষ গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। আদালতে মামলা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও শিল্প গ্রুপের প্রভাব বিস্তার রোধে দণ্ড প্রদানে আপীল করার সময়সীমা সীমিত করা যেতে পারে। লাইসেন্স প্রত্যাহারের ক্ষমতা তদারকি প্রতিষ্ঠানের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ফলে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি কর্তৃপক্ষের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা (Institutional Independence): সরকারের নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে অর্থাৎ তদারকি কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার জন্য তিনটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। এক, তদারকি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ করার নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ক সুস্পষ্ট বিধি-বিধান থাকতে হবে। দুই, প্রতিষ্ঠানের শাসন কাঠামো অবশ্যই একাধিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হতে হবে। তিন, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষা করে যতটুকু সম্ভব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত হবে এবং বিধি-বিধান বিষয়ক সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণের অধিকার জনগণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে।

বাজেট সংক্রান্ত স্বাধীনতা (Budgetary Independence): প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাব কাম্য নয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং প্রয়োজন অনুসারে জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে প্রয়োজনীয় জনবলের জন্য যে ধরনের বাজেট দরকার তা তৈরির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের থাকবে।

---

[১৬] Dr. Shah Md. Ahsan Habib and Md. Mohiuddin Siddique, A Review of the Supervisory initiatives by Bangladesh Bank, Bangladesh Institute of Bank Management; 1st edition (2014)

[১৭] Marc Quintyn, Michael W. Taylor, Should Financial Sector Regulators Be Independent?, International Monetary Fund, Working Paper WP/02/46, March 8, 2004

[১৮] প্রাগুক্ত

২.২.২ তদারকি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

একটি স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে জবাবহিদিতা অন্যতম মূল চাবিকাঠি। একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তার প্রাপ্ত ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার করছে সে বিষয়ে জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উভয় সংকট কাজ করতে পারে, তদারকি প্রতিষ্ঠান যদি প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হয় তাহলে তার স্বাধীনতা থাকে না। আবার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে যে, এই সংস্থা কার কাছে এবং কীভাবে জবাবদিহি করবে। স্বাধীনতা এবং জবাবদিহিতা পরস্পর সম্পূরক। একটি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা যত বেশি তার জবাবদিহি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল দেশে ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীন সংস্থা রয়েছে সেই দেশের ঐ স্বাধীন সংস্থা অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করে।[১৯]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা ও অর্পিত ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থা ভারসাম্য নিয়ে আসে। প্রচলিতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতার জায়গা হচ্ছে আইনসভা, মন্ত্রণালয় বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ (অথবা এগুলোর সমন্বয়)। কখনও কখনও বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা হয়।[২০]

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ উপায় হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতা কাঠামো তৈরি করা। স্বাধীন সংস্থার জন্য একটি পরিস্কার আইনগত ভিত্তি প্রয়োজন। তদারকি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং আদালতের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনতে সংস্থার ক্ষমতা এবং কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচারবিভাগের সাথে সংস্থার সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়টি পরিস্কারভাবে নির্ধারতি হতে হবে। সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ্য বিবৃতি থাকা উচিত, যেমন আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা, নিরাপদ ও সুস্থ ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আমানতকারী এবং অন্যান্য আর্থিক গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। তদারকি সংস্থা তার এখতিয়ার অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে সংস্থার ক্ষমতা এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের নিয়োগ, পুনঃনিয়োগ এবং অপসারণের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে এবং এর প্রক্রিয়া কী হবে সে বিষয়েও আইনে বিশদ ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।[২১]

অনেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা জবাবদিহি ব্যবস্থার সহায়ক হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেআইনি কার্যক্রম চিহ্নিত এবং প্রতিকার করতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ কর্তৃপক্ষের তদারকি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন অথবা ব্যাংকের তথ্যে তাদের অভিগম্যতা থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বেআইনী কার্যক্রমের জন্যই না ব্যাংকের নীতি এবং কর্মসম্পাদনের ব্যর্থতার বিষয়ে জবাবদিহিতার জন্যও এটা প্রয়োজনীয়। এজন্য সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করতে এবং তাদের নীতি এবং কার্যক্রম বিষয়ে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য অনেক ব্যাংক প্রতিবেদন/বিবরণী প্রদানের একটি কাঠামো তৈরি করেছে। এই বিবরণী বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন, সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ্য বিবরণী, আইনসভাকে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক বিবরণী, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও পরিচালনা পর্ষদের সভার বিবরণী প্রকাশ। ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন এসকল প্রতিবেদনে কি ধরনের তথ্য থাকবে তা চিহ্নিত করে দিয়েছে যেমন, এক বছরে কতগুলো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কতগুলো পরীক্ষা বা পরিদর্শন করা হয়েছে, কতগুলোতে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, বা কতগুলোকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে ইত্যাদি।[২২]

২.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সূচকসমূহ

বিভিন্ন গবেষণায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার জন্য যে সকল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সরকারের প্রতিনিধি, পর্ষদ সদস্য নিয়োগ প্রক্রিয়া, পর্ষদের সদস্য সংখ্যা এবং মেয়াদ, গভর্নরের মেয়াদ, সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যেকার সম্পর্ক, এবং মৌলিক আইনসমূহ ইত্যাদি। এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য যে সকল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- সংসদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিবীক্ষণ, সিদ্ধান্ত/নীতি গ্রহণ সভার বিবরণী প্রকাশ, পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ, প্রতিবেদন প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উদ্দেশ্য কতটুকু পূরণ করতে পারবে সে বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রকাশ, সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা, সরকারের নির্দেশনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আপীল করার সুযোগ, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন পরিবর্তন, অতীত কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে গভর্নর অপসারণের সুযোগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মসম্পাদনের লক্ষমাত্রা ঘোষণা, মধ্যবর্তী লক্ষমাত্রা ঘোষণা, মধ্যবর্তী লক্ষমাত্রার তথ্য প্রকাশ, প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা এবং নীতি গ্রহণের কারণ, অন্যান্য নীতির উপর এই সকল নীতির সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাখ্যা, সংসদে গণশুনানী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্ষদ সদস্যদের ভোট প্রকাশ, দ্বন্দ্ব নিরসণ প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নিয়োগের সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি।[২৩]

---

[১৯] Marc Quintyn, 2004, প্রাগুক্ত

[২০] Abigail J. Marcus, 2019, প্রাগুক্ত

[২১] Marc Quintyn, Michael W. Taylor, প্রাগুক্ত

[২২] Abigail J. Marcus, প্রাগুক্ত

[২৩] Florin Cornel DUMITER, Central Bank Independence, Transparency And Accountability Indexes: A Survey, *Timisoara Journal of Economics and Business, ISSN: 2286-0991, www.tjeb.ro,* Year 2014, Volume 7, Issue 1

তৃতীয় অধ্যায়:
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত। এই আইন অনুসারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ বাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ আইন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক কোম্পানীসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করার একক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। এই আইন অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০টি তফসিলি ব্যাংক (৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত, ৩টি বিশেষায়িত, ৯ বিদেশী ব্যাংক এবং ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যার মধ্যে ৩৪টি প্রথাগত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৮টি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক) এবং ৫ অতফসিলি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অংশীজন রয়েছে, এই নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাজে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাজে উল্লেখযোগ্য অংশীজনের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

চিত্র ১: ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

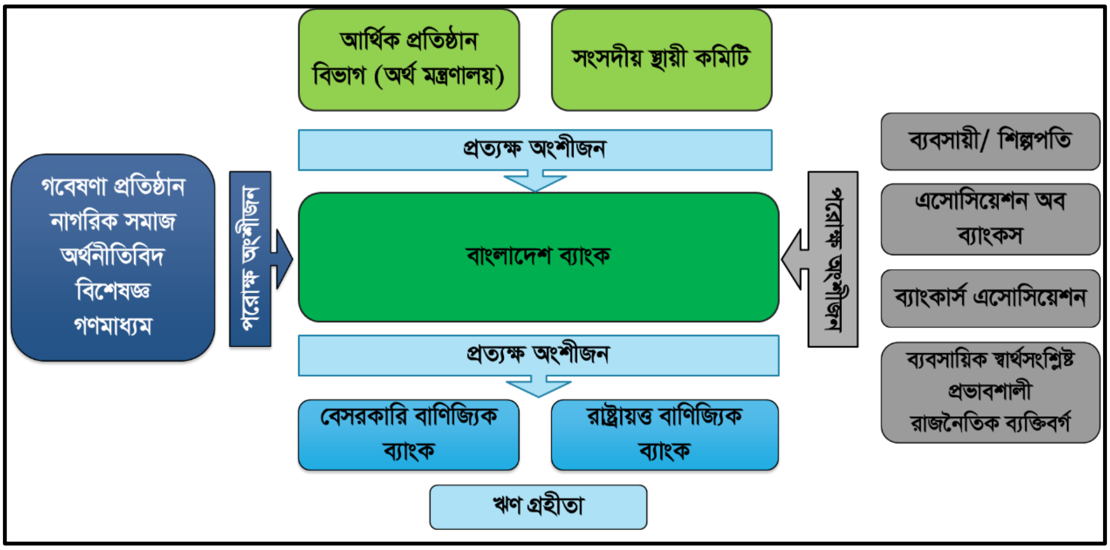

৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে নিরাপদ ও নিবিড় ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যাংকসমূহের অবস্থা মূল্যায়ন এবং উক্ত ব্যাংকের আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনের বিষয়গুলো বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ব্যাংক খাত স্থিতিশীল রাখতে এবং আমানতকারীর স্বার্থ রাক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে[২৪]-

- ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন
- একটি অভীষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে উক্ত বিধি-বিধানসমূহ পালন করতে বাধ্য করা
- এসকল ক্ষেত্রে আইনের কোনো ব্যত্যয় হলে বা কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান করা

আর্থিক স্থিতিশীলতাকে দৃঢ় করতে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি শক্তিশালী করার জন্য কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত 'ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন' ব্যাংক তদারকির প্রবিধান মানদণ্ড ঠিক করে দেয় এবং সদস্য দেশসমূহকে আন্তর্জাতিক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণের সুপারিশ করে থাকে।[২৫] বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল অ্যাকর্ডের সদস্য না হলেও ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রণীত প্রবিধানসমূহে ব্যাসেল মানদণ্ড গ্রহণ করেছে। যে কোনো ধরনের সংকট মোকাবেলা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রাক্ষার্থে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণের বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত চর্চা গ্রহণ করে।[২৬]

৩.২ বাংলাদেশের ব্যাংক ঋণ তদারকি সংশ্লিষ্ট কাঠামো

ব্যাংক তদারকি বিশেষত ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক দুই ধরনের তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে[২৭]-

---

[২৪] Dr. Shah Md. Ahsan Habib and Md. Mohiuddin Siddique, প্রাগুক্ত
[২৫] ব্যাংকস ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলসেন্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bis.org/bcbs/charter.htm
[২৬] Dr. Shah Md. Ahsan Habib and Md. Mohiuddin Siddique, প্রাগুক্ত
[২৭] Dr. Shah Md. Ahsan Habib, প্রাগুক্ত

১. অফসাইট সুপারভিশন বা ব্যাংক থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তদারকি

২. অনসাইট সুপারভিশন বা মাঠ পর্যায়ের তদারকি

গবেষণার পরিধি অনুযায়ী ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের সাথে বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা তদারকির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা করা হলো[২৮]-

৩.২.১ ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড পলিসি বিভাগ: যথাযথ এবং স্থিতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রুডেনশিয়াল বিধান এবং দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- ব্যাংকিং সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা এবং খসড়া প্রণয়ন, ব্যাংক হার, প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যপ্ততা, সম্পদ শ্রেণিকরণ, এবং নিরাপত্তা সঞ্চিতির আদর্শমান নির্ধারণ, কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা পরিবীক্ষণ, ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা পরিবীক্ষণ, ব্যাংকসমূহের হিসারক্ষণের মানদণ্ড ও ব্যাংকের প্রয়োজনীয় তথ্য উম্মোচনের বিষয়গুলো নির্ধারণ, নতুন ব্যাংক অথবা বিদ্যমান ব্যাংকের নতুন শাখার লাইসেন্স প্রদান, ব্যাংকসমূহের নির্বাহী পর্ষদ/প্রধান নির্বহীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা, ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত অথবা ব্যাংকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা পরিবীক্ষণ, এবং ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীনে নির্দেশনা ইস্যু এবং এর পরিপালন নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

৩.২.২ ক্রেডিট ইনফর্মেশন ব্যুরো (সিআইবি): খেলাপি ঋণের ব্যাপ্তি কমিয়ে আনার জন্য ১৮ আগস্ট ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্রেডিট ইনফর্মেশন ব্যুরো তৈরি করা হয়। এই বিভাগ ১৯ জুলাই ২০১১ থেকে এর অনলাইন কর্যক্রম শুরু করে। এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সকল তফসিলি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো ঋণের আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালান্স ৫০,০০০ বা তদূর্দ্ধ টাকা এবং ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ টাকা হলে ঐ সকল ঋণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা, এই ঋণের তথ্য যাচাই এবং প্রক্রিয়াকরণ করে ডাটাবেজ তৈরি করা, অন্তবর্তীকালীন সময়ে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধের ভিত্তিতে এই ঋণ তথ্য হালনাগাদ করা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দাবির ভিত্তিতে এই ঋণ তথ্য শুদ্ধ করা, জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কোনো প্রার্থির খেলাপি ঋণ সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হলে নির্বাচন কমিশনকে উক্ত তথ্য প্রদান, জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন দপ্তরকে ঋণ তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি।

৩.২.৩ ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-১ (ডিবিআই-১): বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংক কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাজের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-১ প্রথাগত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন-সাইট তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই বিভাগ সকল দেশীয় প্রথাগত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে থাকে। এই ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনার গুণগত মানের আলোকে তাদের পারফরমেন্স, পর্যাপ্ত মূলধন, (Capital adequacy), সম্পদের গুনগতমান (Asset quality), আয়, তারল্যের অবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো মূল্যায়ন করার জন্য অন-সাইট তদারকি করা হয়। পরিদর্শনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ক্যামেল (CAMEL) মডেল অনুসারে রেটিং করা হয় এবং এর দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরা হয়। ডিবিআই ব্যাংকগুলোর বুক অফ অ্যাকাউন্ট এবং প্রাসঙ্গিক দলিল/রেকর্ড ইত্যাদি নথি নিরীক্ষা করে। তদারকির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তদারকি দল ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং আইনের প্রতিপালনের অবস্থা দেখতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। ব্যাংকের সম্পদের গুনগতমান যাচাই এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও বাহ্যিক নিরীক্ষক দলের সাথে মত বিনিময়, পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়ম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভায় উত্থাপন (পরিদর্শনের দুই মাসের মধ্যে এই সভা করা ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক), ঋণের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়গুলো পরীক্ষা বা পর্যালোচনার জন্য এই বিভাগ বাৎসরিকভাবে ঝুঁকি ভিত্তিক বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। যেখানে ব্যাংক কর্তৃক ঝুঁকি ভিত্তিক গাইডলাইন প্রতিপালনের বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, অংশীজনদের অভিযোগ বা বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে এই বিশেষ পরিদর্শন হয়ে থাকে। পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন, অভিযোগ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশসহকারে তদারকি পত্র প্রেরণ করা হয়। নীতি বিভাগের সহায়তায় পরিদর্শন বিভাগ পরিদর্শন নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে।

৩.২.৪ ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-২ (ডিবিআই-২): বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে দেশের সকল ব্যাংক তদারকির প্রাপ্ত ক্ষমতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-২ বিভাগ দেশের ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনার কার্যরতা, সম্পদের গুণগতমান, ঝুঁকি উদঘাটনের জন্য এই বিভাগ অন সাইট তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই ব্যাংকগুলোতে তিন ধরনের পরিদর্শন করা হয়, যথা-

১. নিবিড়/নিয়মিত/প্রথাগত পরিদর্শন

[২৮] বাংলাদেশ ব্যাংক, ওয়েবসাইটে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/aboutus/dept/depts.php

২. ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন

৩. বিশেষ পরিদর্শন/আকস্মাৎ পরিদর্শন

নিবিড় পরিদর্শন বাৎসরিকভাবে করা হয়ে থাকে, যেখানে প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন, তারল্য অবস্থা ও ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন, বৃহৎ ঋণ ও কেন্দ্রীভূত ঋণের নিবিড় বিশ্লেষণ, প্রতারণা-জালিয়াতি চিহ্নিত করা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্পোরেট গভর্নেন্সের গুণগতমান, গ্রাহক সেবা মুল্যায়ন, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গাইডলাইন/নির্দেশনা/পরিপত্র প্রতিপালনের বিষয়সমূহ মূল্যায়ন করা হয়। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থ পাচার ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে বাৎসরিক হিসেবে তদারকি করা হয়। ব্যাংকের হতে পাঠানো বিবরণী বা সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে কোনো ঝুঁকি বা দুর্বলতা চিহ্নিত হলে তার উপর ভিত্তি করে নিয়মিত পরিদর্শনের বাইরে বিশেষ পরিদর্শ পরিচালনা করা হয় অথবা কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের নির্দেশেও পরিদর্শন পরিচালিত হয়। পরিদর্শনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ক্যামেল (CAMEL) মডেল অনুসারে ব্যাংকসমূহের রেটিং করা হয় এবং এর দূর্বলতাগুলো তুলে ধরা হয়। পরিদর্শনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কী না তাও পরিবীক্ষণ করা হয়। এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং ইউনিট নামে একটি বিশেষ ইউনিট ব্যাংকের প্রতিপালনের বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে থাকে।

৩.২.৫ অফসাইট সুপারভিশন বিভাগ: নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সুস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য প্রতিটা ব্যাংকের বিভিন্ন রিটার্ন/আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো তদারকি, একই সাথে ব্যাংকিং শৃঙ্খলা নিশ্চিত ও আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোপনীয়তা রক্ষা করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এর প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- CAMELS এর ভিত্তিতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর পারফরমেন্স বিশ্লেষণ এবং পরিবীক্ষণ, কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকের দূর্বলতা থাকলে সেটাকে 'আর্লি ওয়ার্নিং ক্যাটাগরি' বা 'প্রব্লেম ব্যাংক ক্যাটাগরি' হিসেবে চিহ্নিত করে নিবিড়ভাবে এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ব্যাংকের প্রয়োজনীয় তারল্য হার (Statutory Liquidity Requirements) পরিবীক্ষণ এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদান, ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, তফসিলি ব্যাংকের কাছ থেকে নেওয়া সরকারের বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণ পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সার্বিক ঋণ, আমানত, বিনিয়োগ এবং তরল অর্থের অবস্থা পরিবীক্ষণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক করা হয়েছে এমন রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড) এবং দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংকের (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) স্মারক অনুসারে এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষা কমিটির সভার বিবরণী এবং নিরীক্ষা করা হয়েছে এমন আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা, এবং এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংককে প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান, আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আমানত বীমা এবং সামাজিক নিরাপত্তা (সেফটি নেটস) সরবরাহ এবং এভাবে বাজারের নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, তফসিলি ব্যাংকের বৃহৎ ঋণের দলিলপত্র পর্যালোচনা, অবসায়িত ব্যাংকের সম্পদ/দায় রক্ষণাবেক্ষণ করা, অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসেবে দেউলিয়া ব্যাংকের সম্পত্তি বিষয়ক মামলা পরিচালনা, ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে উপস্থিত থাকা (ব্যাংক গ্যারান্টির সাথে সম্পৃক্ত অভিযোগসহ) ইত্যাদি।

৩.২.৬ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিভাগ: ব্যাংকিং খাতে জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধে ২০১২ সাল থেকে এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এই বিভাগের অধীনে মোট তিনটি বিভাগ রয়েছে-ভিজিল্যান্স এন্ড এন্টি-ফ্রড ডিভিশন, কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশন এবং টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ডিভিশন। এর মধ্যে ভিজিল্যান্স এন্ড এন্টি-ফ্রড ডিভিশনের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, জালিয়াতি ও প্রতারণার বিষয়সমূহ নজরদারি করা, গ্রহকের অভিযোগের ভিত্তিতে অনসাইট পরিদর্শন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.৩.১ ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ: বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত ক্রেডিট রিস্ক ম্যানুয়েল (CRM) এবং তাদের নিজস্ব ঋণ নীতি, লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রতিটা ব্যাংক তাদের ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একটি ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় গ্রহকের ঋণ প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং শেষ হয় প্রদত্ত ঋণ আদায়ের মাধ্যমে।

প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঋণের ধরন অনুযায়ী শাখা, অঞ্চল, বিভাগ অনুসারে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি যথাযথভাবে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সাধারণত একটি ব্যাংকের প্রতিটি শাখা, অঞ্চল, বিভাগ এবং প্রধান কার্যালয়ে একটি করে ক্রেডিট কমিটি থাকে যারা একটি ঋণ প্রস্তাবের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে থাকে। সংযোগ কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপক বা মার্কেটিং কর্মকর্তা বা ইউনিট প্রাথমিকভাবে ঋণ গ্রহীতার সাথে যোগাযোগ করে থাকে। প্রথমে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় যে ব্যাংক হতে কী কী ধরনের ঋণ সুবিধা দেওয়া যাবে এবং এর জন্য ঋণ গ্রহীতাকে কী করতে হবে। তারপর ব্যবস্থাপক বা মার্কেটিং কর্মকর্তা নিশ্চিত করবে যে প্রস্তাবিত ঋণ খাত অনুযায়ী বা ঋণসীমা অনুসারে অনুমোদনযোগ্য কী না। আলোচনার পর গ্রাহক নির্ধারিত ফর্মে তার ঋণ প্রস্তাব জমা দেয়। ঋণ প্রস্তাব পাওয়ার পর উক্ত কর্মকর্তা জমাকৃত তথ্য যাচাই বাছাই করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফর্মেশন ব্যুরো থেকে ঋণ তথ্য যাচাই করা। সঠিক ঋণ গ্রহীতা বাছাই করতে ঋণ মূল্যায়ন করা অবশ্য পালনীয়। এক্ষেত্রে শাখা

ব্যবস্থাপক ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক, বিপণন, প্রযুক্তি, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়ন করে থাকে। এছাড়াও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করা হয়। সার্বিকভাবে এই মূল্যায়নে ঋণ প্রস্তাব এবং এর উদ্দেশ্য, ঋণ গ্রহীতা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণ, ক্রেতা/সরবরাহকারী, আর্থিক ইতিহাস, সম্ভাব্য আর্থিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য ঋণের অনুকূলে প্রস্তাবিত জামানতও মূল্যায়ন করা হয়। অধিকন্তু ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং স্কোর শিট পূরণ করে আগ্রহী ঋণ গ্রহীতাদের গ্রেডিং করা হয়। ব্যাসেল ২ এর নির্দেশনা অনুসারে বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার রেটিং করানোর কথা বলা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক সরবরাহকৃত দলিলের উপর ভিত্তি করে এই মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া মার্কেট রিপোর্ট, হিসাব পর্যালোচনা, আর্থিক বিবরণী, সিআইবি তথ্য, বাহ্যিক রেটিং, এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয়গুলোর পর্যালোচনাগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। গ্রুপ অব কোম্পানীর কর্পোরেট ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটিকে এককভাবে বা সম্পূর্ণ গ্রুপের মূল্যায়ন করা হয়। ঋণ সিন্ডিকেশনের (একই ঋণ গ্রহীতাকে একাধিক ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে ঋণ প্রদান) ক্ষেত্রে প্রধান ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক পৃথকভাবে এই মূল্যায়ন করে থাকে। ঋণের পরিমাণ, ঋণের ধরন, ঋণের উদ্দেশ্য ও গঠন, এবং ঋণের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক ব্যবস্থাপক কর্তৃক মূল্যায়িত ঋণ প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে থাকে।[২৯]

৩.৩.২ ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন: প্রধান নির্বাহী বা পরিচালনা পর্ষদ ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের কর্তৃত্ব সিনিয়র ঋণ নির্বাহীর উপর অর্পন করে থাকে তবে এটা ব্যাংকভেদে ভিন্ন হতে পারে। অর্পিত এই দায়িত্ব প্রতি বছর মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ব্যাংকের আকার ও কৌশলের উপর নির্ভর করে কিছু ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের কর্তৃত্ব কেন্দ্রের অধীনে অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়ের অধীনে থাকে। তবে সাধারণভাবে অঞ্চল, বিভাগ, এবং শাখা পর্যায়ে এই কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। ক্রেডিট রিস্ক গাইডলাইন অনুসারে যদি প্রস্তাবিত ঋণ ব্যাংকের মূলধনের ১৫ শতাংশ হয়, তাহলে সাধারণত তা অনুমোদনের ক্ষমতা ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের হাতে থাকে, মূলধনের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে থাকে, আর ২৫ শতাংশের বেশি হলে তা ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা প্রধান নির্বাহীর সুপারিশক্রমে অনুমোদনের ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির/পরিচালনা পর্ষদের। আঞ্চলিক ঋণ কর্মকর্তার অনুমোদিত ঋন প্রস্তাবনাসমূহ মাসিক ভিত্তিতে কর্পোরেট ঋণ/ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ/গ্রাহক ঋণ শাখার প্রধানের নিকট প্রেরণ করতে হয়। ব্যাংকের নীতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা দেখতে প্রধান কার্যালয় আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাবনার ১০ শতাংশ পর্যালোচনা করতে হয়। ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের প্রধান ঋণ অনুমোদনের পূর্বে ঋণ প্রস্তাব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের নিটক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করে থাকে। তাদের পর্যবেক্ষণের পর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রধান তা অনুমোদন করে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এই ঋণ অনুমোদন বা বাতিল করে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট প্রেরণ করে। [৩০]

৩.৩.৩ দলিল নথিকরণ ও ঋণ প্রদান এবং ঋণ পরিবীক্ষণ ও ফলো-আপ: অনুমোদন পাওয়ার পর শাখা ব্যবস্থাপক অনুমোদনের দুই কপি করে এক কপি ঋণ প্রশাসন বিভাগ এবং এক কপি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করে। এরপর ঋণ প্রশাসন বিভাগ শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুমোদন পত্র প্রেরণ করে থাকে, গ্রাহক উক্ত শর্তের সাথে একমত হতে হয়। ব্যবস্থাপক নথিকরণের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করে এবং তা ঋণ প্রশাসন বিভাগে গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। ঋণ প্রশাসন বিভাগ ঋণ প্রদান, ঋণ জামানত দলিল সংরক্ষণ, ঋণ পরিবীক্ষণ এবং অন্যান্য অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো যেমন সিআইবিতে তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ঋণ প্রদানের পর ব্যবস্থাপক নিয়মিতভাবে এই ঋণ ফলো-আপ করবে। ব্যবস্থাপকের পাশাপাশি ঋণ প্রশাসনের অধীনস্ত পরিবীক্ষণ বিভাগ দিন-তারিখ অনুসারে ঋণ ফলো-আপ করে হিসাবের পূর্বসতর্কতা চিহ্নিত এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। ঋণ নীতি অনুসারে ব্যবস্থাপক ঋণকে শ্রেণিকরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চিতি সংরক্ষণ করবে।[৩১]

ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত ঋণ ঝুঁকি ম্যানুয়েল এবং তাদের নিজস্ব ঋণ নীতি অনুসরণ করতে হয়। এবং তাদের আইনের প্রতিপালন নিশ্চিত করতে এবং ঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং আমানতকারীদের স্বার্থ পরিপন্থি কার্যক্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা।

৩.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি বিভাগের একটি হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (FID) ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পূর্বে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থ বিভাগের অন্তর্গত একটি উইং-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছিলো। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজি বাজার, বীমা খাত এবং ক্ষুদ্র ঋণ খাতের সাথে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগ পুঁজির পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং বিদ্যমান নীতি ও কর্মসূচির পর্যালোচনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ), সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, (BMDF) এবং বাংলাদেশ

---

[২৯] Banerjee, P.K., Karmaker, D.R., Pandit, A.C., Hossain, M.M., Rahman, T., Faisal, N.A. and Azam, M.T. (2015). "Credit Operations of Banks – 2014", *Banking Review Series 2015*, Paper 1, pp. 01-58, BIBM, Dhaka.

[৩০] Banerjee, P.K., প্রাগুক্ত

[৩১] Banerjee, P.K., প্রাগুক্ত

এনজিও ফাউন্ডেশন ইত্যাদি সংস্থায় প্রদত্ত বিদেশী ঋণ ও অন্যান্য সহায়তার যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে তদারকি করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি (BIA) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA)-এর সাথে সমন্বয়মূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।[৩২]

৩.৫ অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি: সংসদীয় কমিটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব মূল্যায়ন এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের কর্মকান্ড সমীক্ষার উদ্দেশ্যে সংসদ-সদস্যদের নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিমালা দ্বারাই এই কমিটির প্রায়োগিক দায়দায়িত্ব, সামগ্রিক কর্মতৎপরতা এবং কার্যপরিধি নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই কমিটির কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিল বিবেচনা, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা এবং সঠিকভাবে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের বিষয় পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর ৩৮A ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংককে বছরে ন্যুনতম একবার বা যে কোনো প্রয়োজনে সংসদীয় কমিটির আহবানে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে মুদ্রানীতি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা এবং প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে।[৩৩]

৩.৬ ব্যাংক এসোসিয়েশনসমূহ: বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বেশ কিছু প্রভাবশালী অংশীজন রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)। এই এসোসিয়েশন মূলত বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমুহের সংগঠন যা সদস্য ব্যাংকগুলির উপদেষ্টা হিসাবে এবং ব্যাংকিং খাতের সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকে। বিএবি ১৯৯৩ সালে ৯টি বেসরকারী ব্যাংক নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৮টি। বিএবি'র পরিচালনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান একটি কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে, যা সদস্য ব্যাংকসমূহের মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। বিএবি'র মূল কাজ হচ্ছে সদস্য ব্যাংকসমূহের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা। এর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি সর্বজনীন আদর্শ মানের বিকাশ ঘটানো, ব্যাংকিং খাতের সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা, ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার, সদস্য ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যবধান দূর করতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সাময়িকী, নিউজলেটার এবং নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ, ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য সময় সময় নির্দেশনা প্রদান, ব্যাংকিং-এর সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নীতি এবং অনুশীলন প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দেশের ব্যাংকিং খাতে কাজে লাগানো ইত্যাদি।[৩৪]

৩.৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ: আর্থিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে এবং নিরাপদ ও সুস্থ ব্যাংকিং খাত নিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি পদ্ধতি ও কৌশলে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে-

- ব্যাসেল কাঠামো প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্তাকে শক্তিশালীকরণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন প্রণয়ন
- স্ট্রেস টেস্টিং ব্যবস্থা প্রচলন (সম্ভাব্য অভিঘাতের বিপরীতে ব্যাংক ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য)
- ক্যামেল রেটিং ব্যবস্থার প্রয়োগ
- ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম চালু
- ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সম্ভাব্য অনিয়ম এবং জালিয়াতি চিহ্নিত করতে একটি ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড চালু করা
- ব্যাংকের পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনাকে জবাবদিহি করতে ব্যাংকসমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরযুক্ত নিজস্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য সার্কুলার প্রদান
- অফসাইট ও অনসাইট তদারকির মধ্যেকার সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন

[৩২] আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অনুবন্ধ, বিস্তারিত দেখুন: https://fid.gov.bd/site/page/
[৩৩] বাংলাপিডিয়া, বিস্তারিত দেখুন: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=সংসদীয়কমিটি
[৩৪] বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস, ওয়েবসাইট হতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bab-bd.com/

বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্পোরেট গভর্নেন্স না থাকা, বাণিজ্যিক ব্যাংসমূহের উচ্চ পর্যায়ের চাপে যথাযথভাবে যাচাই না করেই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান, স্বজনপ্রীতি বা ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া, ব্যাংকারদের দুর্নীতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান, ব্যাংকের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, ঋণের বিপরীতে অপর্যাপ্ত জামানত, প্রদত্ত ঋণ যথাযথ মনিটরিং না করা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ এবং আগ্রাসী ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির অনুপস্থিতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ না করে পরিচালনা পর্ষদ গঠন, প্রধান নির্বাহী এবং উচ্চ পর্যায়ের নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতি, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মানদণ্ড অনুসরণ না করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে। এর ফলে ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সূচক, যেমন, ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ, খেলাপি ঋণের হার, আয়-ব্যয় অনুপাত হার, ঋণ-আমানত অনুপাত হার ইত্যাদি বিষয়ের অবনতি ঘটে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ তদারকিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকায় যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষণীয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সীমাবদ্ধতা এবং এর কারণ সমূহ এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচনা করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায়:
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি স্বাধীনতায় বাহ্যিক চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র

বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯) অনুযায়ী জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫৭টি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লক্ষ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা যা মোট প্রদত্ত ঋণের ১১.৭ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বেড়ে দাড়ায় ১১৬,২৮৮ কোটি টাকায় যা মোট ঋণের ১২.০ শতাংশ।[৩৫] বিশেষজ্ঞদের মতে খেলাপি ঋণের এই হার বিপদজনক মাত্রায় রয়েছে। কিন্তু অবলোপনকৃত ঋণ এবং আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণসহ কাগজে কলমে দেখানো এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর একটি প্রতিবেদনে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদর্শিত খেলাপি ঋণের সাথে (১১২,৪২৫ কোটি টাকা) সাথে আদালত কর্তৃক ৬৭৫ টি স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত বৃহৎ ঋণ (৭৯,২৪২ কোটি টাকা), বারবার পুনঃতফসিলকৃত বা পুনর্গঠিত ঋণ (২৭,১৯২.১৭ কোটি টাকা) এবং ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসে নতুন করে পুনঃতফসিল করা ঋণের (২১,৩০৮ কোটি টাকা) পরিমাণ যোগ করে বাংলাদেশে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দুই লক্ষ ৪০ হাজার ১৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৬] অপর একটি প্রতিবেদনে আইএমএফ-এর এই হিসেবের সাথে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ (৫৪,৪৬৩ কোটি টাকা) যোগ করে জুন ২০১৯ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ কোটি বলে টাকা দাবী করা হয়।[৩৭]

২০০৯ সাল শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা।[৩৮] সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পরবর্তী দশ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৯৩ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১৭ শতাংশ, যদিও একই সময়ে মোট ঋণ বৃদ্ধির হার ৩১২ শতাংশ। গড়ে প্রতি বছর নয় হাজার ৩৮০ কোটি টাকা করে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খেলাপি ঋণের ৮৬.৫ শতাংশই কু-ঋণ যার বিপরীতে শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতি (Provision) সংরক্ষণ করতে হয়।[৩৯] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১০ সাল হতে ২০১৫ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণের এই বৃদ্ধিকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৪০]

চিত্র ২: বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের বছরভিত্তিক চিত্র (কোটি টাকা)

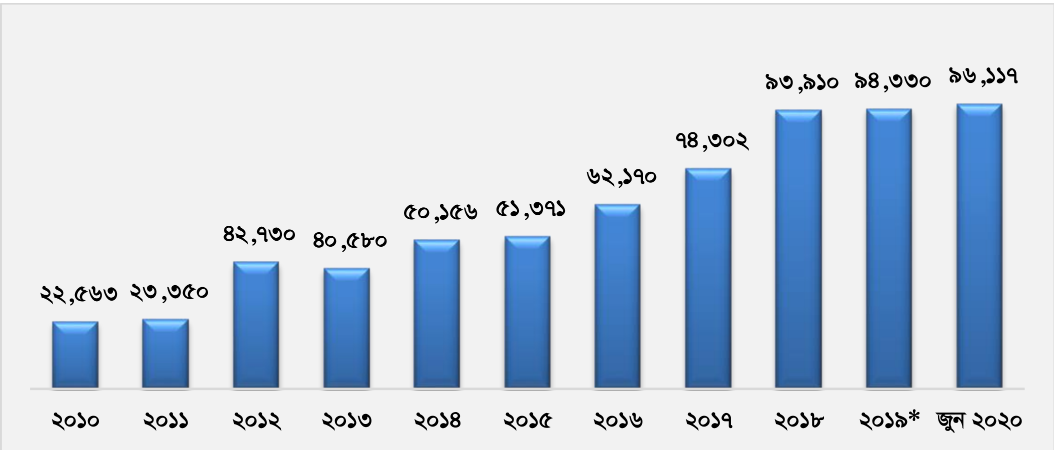

**সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ খেলাপি ঋণ ছিল ১১৬,২৮৮ কোটি টাকা; পরবর্তীতে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ হ্রাস করে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৯৪,৩৩০ কোটি টাকা দেখানো হয়*

এই বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণের বাইরে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে খেলাপি ঋণ প্রতিনিয়ত পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে যাকে স্ট্রেসড বা দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ বলে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের পরিমাণ মোট ৮৯ হাজার

---

[৩৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/pub/index.php

[৩৬] দ্য ডেইলি স্টার, 'Bad Loans Twice as Large', ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বিস্তারতি দেখনু: https://www.thedailystar.net/frontpage/default-loan-in-bangladesh-is-more-than-double-reports-imf-1805437, (২০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে সংগৃহীত)

[৩৭] ড. মইনুল ইসলাম, ব্যাংকিং খাত নিয়ে উল্টোপাল্টা পদক্ষেপ বন্ধ করুন: ব্যাংকিং সংস্কার কমিশন গঠন করুন, ১২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সুশাসনের জন্যে নাগরিক (সুজন) কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠেয় ব্যাংকিং খাত পরিচালনা সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত 'মূল প্রবন্ধ'।

[৩৮] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯-১০

[৩৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, ইস্যু: ১৯, ২০১৯ (III), জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯

[৪০] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-১৪৩, বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/site/files/d40d434b-5afa-48ec-854b-6ce391c466d6/

২৪০ কোটি টাকা।[৪১]পরবর্তীতে ২০১৯ সালে পুনঃতফসিলিকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫২ হাজার সাত শত ৬৭ কোটি টাকা।[৪২]২০১৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নির্দেশনায় খেলাপি ঋণের মাত্র ২ শতাংশ ফেরত দিয়ে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়।[৪৩]এভাবে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ আদায় না করেই সেপ্টেম্বর ২০১৯ সাল হতে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কমিয়ে সর্বশেষ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৯২,৫১০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হিসেবে দেখানো হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু খেলাপি ঋণ বারবার পুনঃতফসিল করা হয়েছে এবং এবং তা পুনরায় খেলাপি হয়েছে। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সার্কুলারের মাধ্যমে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নতুন কোনো ঋণকে খেলাপি না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[৪৪]ঋণ খেলাপিদের নানা ধরনের সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও জুন, ২০২০-এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৬ হাজার ১১৭ কোটি টাকা।[৪৫]

বিগত কয়েক বছরে খেলাপি ঋণের সাথে সাথে ব্যাংকিং খাতে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও জালিয়াতি/প্রতারণাও ভয়াহব রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশ বছরের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংকের এননটেক্স, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ইত্যাদি আর্থিক কেলেঙ্কারীর ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যাংক খাতের ১০টি কেলেঙ্কারীতে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ২২,৫০২ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়।[৪৬]

ঋণ খেলাপি এবং ঋণ জালিয়াতির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে মূলধন ঘাটতি সৃষ্টি হয় সেই বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের ঘাড়ে চাপানো হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মূলধন ঘাটতি মেটাতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে ১২ হাজার ৪৭২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করে।[৪৭] খেলাপি ঋণের এই উচ্চ হার রোধ করতে না পারা, ব্যাংকসমূহে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের কার্যকরতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে; এক, ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন; দুই, ব্যাংকসমূহকে উক্ত বিধি-বিধানসমূহ পালন করতে বাধ্য করা এবং তিন, এক্ষেত্রে আইনের কোনো ব্যত্যয় হলে বা কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান করা। কিন্তু এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামোয় উল্লিখিত সুশাসনের সূচকের আলোকে বিশ্লেষিত প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির মাধ্যমে খেলাপি ঋণের উচ্চ হার রোধ, ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়।

চিত্র ৩: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ

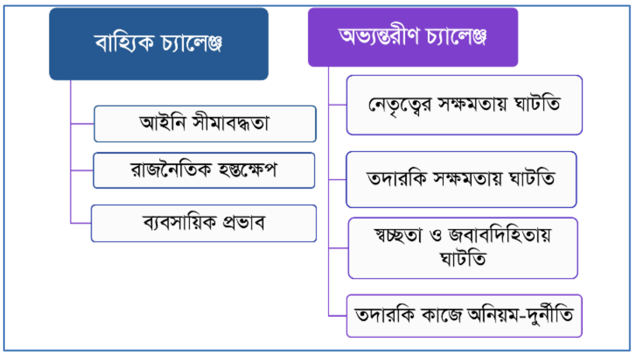

এক হচ্ছে বাহ্যিক বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ যার মধ্যে রয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ব্যবসায়িক প্রভাব। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি, নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা

[৪১] বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/pub/index.php
[৪২] বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/pub/index.php
[৪৩] বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫, (ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা), ১৬ মে ২০১৯
[৪৪] বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআরপিডি সার্কুলার নং-৪, (ঋণ শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে), ১৯ মার্চ ২০১৯
[৪৫] দৈনিক প্রথম আলো, 'শীর্ষে অগ্রণী, এবি, ন্যাশনাল ও প্রিমিয়ার', ২৫ আগস্ট ২০২০, (২৫ অগস্ট, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/
[৪৬] Fahmida Khatun, State governance in the Banking Sector; dealing with the recent shocks, State of the Bangladesh Economy in FY 2011-2012, CPD, 2012
[৪৭] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, 'মূলধন ঘাটতি পূরণে অর্থ পেল না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক', ২ জুলাই ২০১৯, বিস্তারিত দেখনু: https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2019/07/02/786376 (৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং তদারকি কাজে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মূলত তিনভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন তদারকির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জসমূহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বিশ্বজুড়েই আলোচনার বিষয়। পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার এখতিয়ারভুক্ত দায়িত্ব পালনে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও কার্যসম্পাদনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে সেখানে রাজনৈতিক ও বেসরকারি প্রভাব দমন করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা তদারকির ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল নিয়ে আসে। কার্যকর তদারকির জন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনটি বাধা লক্ষ্য করা যায়-

১. **আইন ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামোর কিছু সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাকে সীমিত করে এবং ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ব্যবসায়িক অংশ কর্তৃক তাদের ইচ্ছে অনুসারে ব্যাংকিং বিষয়ক আইন পরিবর্তন, ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে এর পরিচালন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাকে খর্ব করা, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে।

৩. **ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব:** একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, তাদের ইচ্ছে অনুসারে ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট প্রুডেনশিয়াল প্রবিধান ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়ে নেওয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করা, তদারকি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা ও আইনের লঙ্ঘন এবং ঋণ গ্রহণে সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে।

৪.১ আইন ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা

ব্যাংকিং খাত সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখতে এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে এ সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো হলো একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ামক। ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ ইত্যাদি। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানের (Prudential regulation) মধ্যে রয়েছে, মূলধন পর্যাপ্ততা নীতি, ঋণ শ্রেণিকরণ ও নিরাপত্তা সঞ্চিতি নীতি, একক বৃহত্তম ঋণ সীমা নীতি, ঋণ পুনঃতফসিল নীতি, অবলোপন নীতি, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় কর্পোরেট গভর্নেন্স, ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগসহ বিভিন্ন কমিটি গঠন নীতিমালা ও গাইডলাইন ইত্যাদি। গবেষণা ফলাফলে পাওয়া যায় যে, ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী আইন কাঠামো থাকলেও বিদ্যমান আইন কাঠামোতে এখনও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষভাবে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রণ ও তাদরকি কার্যক্রমকে দুর্বল বা সীমিত করে এবং রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া বেশ কিছু আইন রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি ও নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং যা ব্যাংকিং খাতে কতিপয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় এবং খেলাপি ঋণকে উৎসাহিত করে বা এর সহায়ক হিসেবে কাজ করে। নিম্নে এসকল আইনের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হলো-

৪.১.১ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা থেকে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই আইন অনুসারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম একটি কাজ।[৪৮]অধ্যাদেশের ধারা ৯ (২) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও বেশ কিছু ধারা রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করে ও তদারকি কার্যক্রমকে সীমিত করে। ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন কর্তৃক প্রণীত ব্যাংক তদারকির মূলনীতিতে (কোর প্রিন্সিপলস অব ইফেকটিভ ব্যাংকিং সুপারভিশন) ব্যাংক তদারকি কার্যক্রমকে কার্যকরী করতে ২৯ টি মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়। যার মধ্যে ১৩টি মূলনীতিতে তদারকি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলীর উপর আলোচনা করা হয়।[৪৯] ব্যাসেল মূলনীতি ১ ও ২- এ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, উদ্দেশ্য, দায়িত্ব, ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু মানদণ্ড ঠিক করে দেয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

[৪৮] বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, ধারা ৭এ(এফ)।

[৪৯] Basel committee on Banking Supervision , Core Principles for effective banking supervision (Version effective as of 15 Dec 2019), (2019), Bank for International Settlements, BCP01: The core principles, page 14 & 34-38 Accessed to https://www.bis.org/basel_framework/standard/BCP.htm at 29.12.2019

- তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা এবং পরিচালন কাঠামো আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। সরকার বা শিল্প-ব্যবসায়ী কেউ এর উপর হস্তক্ষেপ করবে না
- তদারকি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালনা পর্ষদ সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে
- বিধি-বিধানের প্রতিপালন নিশ্চিতে যে কোনো ব্যাংকে প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান
- তদারকি প্রতিষ্ঠানের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে
- প্রুডেন্সিয়াল মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি[৫০]

গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ বিষয়ে ধারা ১০(৩) ও (৪) এ বলা হয়েছে সরকার নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করবে।[৫১] এবং ধারা ১৫(১) বলা হয়েছে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হলে সরকার তাদের অপসারণ করতে পারবে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠন সম্পর্কে অধ্যাদেশের ধারা ৯ (৩) এ বলা হয়েছে, গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ও এর বাইরে সরকার কর্তৃক মনোনিত চারজন সদস্য সরকারের মতে যাদের ব্যাংকিং, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে পর্ষদ গঠিত হবে। এবং পর্ষদ বিলুপ্তকরণ সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৭ এ বলা হয়েছে সরকারের মতে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত কোনো দায়িত্ব/কার্যভার পালনে ব্যর্থ বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে পরিপত্র জারির মাধ্যমে সমগ্র পরিচালনা পর্ষদকে স্থগিত করার ক্ষমতা সরকারের। গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও পর্ষদ সদস্য মনোনয়ন এই তিনটি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি, বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, বাছাই কমিটি গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আইনে সুস্পষ্ট কোনো বিধান না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষে নিয়োগের যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন করা হয়। নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ না করায় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এককভাবে সরকারের পছন্দমাফিক ব্যক্তিদের নিয়োগ বা মনোনয়ন দেওয়া হয়। যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চেক এন্ড ব্যালেন্সের ঘাটতি তৈরি করে এবং ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাবেক একজন গভর্নরের পদত্যাগের দুই ঘন্টার মধ্যেই সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন একজন গভর্নর নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। উল্লিখিত সবগুলো বিষয়েই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও অনুকরণীয় চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।[৫২]পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তা রাখার বিধান আন্তর্জাতিকভাবে অনুকরণীয় চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর উল্লিখিত ধারাসমূহ ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বিষয়ক আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত ব্যাসেল মূলনীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

গভর্নর নিয়োগ ও পর্ষদ গঠনে আন্তর্জাতিক চর্চা: নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক

গভর্নর, অর্থমন্ত্রণালয়ের সচিব, দুইজন ডেপুটি গভর্নর এবং নেপাল সরকারের দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক মনোনিত তিনজন সদস্য নিয়ে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংকের পর্ষদ গঠিত। দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট (নেপাল সরকারের অর্থমন্ত্রী, একজন সাবেক গভর্নর এবং একজন বিশেষজ্ঞ) 'দ্য গভর্নর রেকমেনডেশন কমিটি'র সুপারিশকৃত তিনজন ব্যক্তির মধ্যে থেকে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার একজনকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়। এছাড়া গভর্নর কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দিয়ে থাকে। সকল নিয়োগ, মনোনয়ন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়সমূহ আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫২]

[৫০] ব্যাসেল কমিটি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৯

[৫১] বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, ধারা ১০ (৩)(৪) ।

[৫২] নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক অ্যাক্ট, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nrb.org.np/category/acts/?department=lgd

সারণী ২: সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়োগ ও অপসারণ চর্চা

বিষয়	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া[৫৩]	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা[৫৪]	নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক[৫৫]
পর্ষদ কাঠামো	গভর্নর, চারজন ডেপুটি গভর্নর, ১৪ জন মনোনিত সদস্য এবং দুইজন সরকারি কর্মকর্তা	গভর্নর, অর্থ সচিব ও তিনজন মনোনিত সদস্য	গভর্নর, অর্থ সচিব, দুইজন ডেপুটি গভর্নর এবং তিনজন মনোনিত সদস্য
পর্ষদ সদস্য নিয়োগ	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ক্যাবিনেট নিয়োগ কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিলের সম্মতি সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনয়ন	দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক মনোনয়ন
গভর্নর নিয়োগ	অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে ক্যাবিনেট নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়োগ	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগ	দ্য গভর্নর রেকমেনডেশন কমিটির সুপারিশে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক নিয়োগ
ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ	ঐ	অর্থমন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে মানিটারি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ	গভর্নরের প্রস্তাবকৃত তালিকা থেকে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক নিয়োগ
অপসারণ	সরকার কর্তৃক অপসারণ	অর্থমন্ত্রীর সুপারিশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গভর্নর বা মনোনিত সদস্য অপসারণ	তদন্ত কমিটির সুপারিশে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক অপসারণ
পরিচালন কাঠামো, নিয়োগ ও অপসারণ প্রক্রিয়া, যোগ্যতা ও উপযুক্ততাসমূহ আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ			

৪.১.২ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের আইনি কাঠামোর একটি মৌলিক ভিত্তি। বাংলাদেশের ব্যাংক কোম্পানী পরিচালনা, এর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম মূলত ১৯৯১ সালে প্রণীত এই আইন দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। এই আইনে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে তদারকি ক্ষমতা প্রদান করলেও কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় যা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে সীমিত করে। এবং একই সাথে ব্যাংকিং খাতের সুশাসনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে।

এই আইনের ধারা ৪৬(১) অনুযায়ী, কোন ব্যাংকের চেয়ারম্যান বা কোন পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী ব্যাংকের জন্যে বা ব্যাংকের আমানতকারীদের জন্যে ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত বলে গণ্য হলে তা প্রতিরোধে তথা জনস্বার্থে উক্ত চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে অপসারণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের। কিন্তু ধারা ৪৬ (৬) এ বলা হয়েছে সরকার কর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত কোন চেয়ারম্যান বা পরিচালক, যে নামেই অবহিত হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে অপসারণ করতে পারবে না।[৫৬] ২০১৩ সালে সংশ্লিষ্ট সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ক্ষমতাকে রদ করা হয়েছে। এই উপধারা ব্যাংকিং খাতের একক নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মোট খেলাপি ঋণের অর্ধেকের বেশি অংশ এই ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের। বিদ্যমান ধারাগুলো ব্যাসেল কমিটির ব্যাংক তদারকির মূলনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এবং যা সুশাসন চর্চার একটি অন্যতম অন্তরায়।

ধারা ৫৮ অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীদের ক্ষতি করছে, এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা সরকারের উপরে ন্যাস্ত। ধারা ৭৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলেও কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ এবং ব্যাংক-কোম্পানীর পূনর্গঠন বা একত্রীকরণ করতে পারে না, এক্ষেত্রে তারা সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাতের সর্বোত্তম স্বার্থে কোনো ব্যাংক কোম্পানির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের মুখাপেক্ষি হওয়া নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থানকে দুর্বল করে। আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং ব্যাংকের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে খর্ব করে। ব্যাসেলের মূলনীতি ২ এ বলা হয়েছে যখন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোনো ব্যাংক আইন মেনে চলছে না বা এর কার্যক্রম

[৫৩] রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৪, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট, উৎস: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIA1934170510.PDF

[৫৪] মানিটারি ল অ্যাক্ট, ১৯৪৯, সেন্ট্রল ব্যাংক অব শ্রীলংকা, উৎস: https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/acts/legislative-enactments

[৫৫] নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, প্রাগুক্ত

[৫৬] ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, ধারা ৪৬ (১) (৬) ।

অনিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয় তখন ঐ ব্যাংকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে।[৫৭] কিন্তু উল্লিখিত ধারা দুইটি ব্যাসেলের এই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

ধারা ১৫(৬)(অ) অনুসারে কোনো ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলির মধ্যে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকার অবশ্যকতা রয়েছে। আবার, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রনীত ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইনে (২০১০) পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত নীতিমালা অংশে (অনুচ্ছেদ ২)-এ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠিতে উত্তীর্ন হওয়ার আবশ্যকতাতেও একই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতার এ মাপকাঠিতে যে কোনো পেশায় ন্যূনতম দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলেই যোগ্য বিবেচিত হওয়ার এরূপ বিধানের ফলে সংশ্লিষ্টখাত বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন, অনুপযুক্ত, অদক্ষ ব্যক্তির পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করছে যা সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বিশেষত ঋণ ব্যববস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি। তাছাড়া, পরিচালক হিসেবে নিয়োগলাভের ক্ষেত্রে অদ্যবধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পেশাগত ক্ষেত্রে নৈতিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক সচ্ছতার মতো অতীবগুরুত্বপূর্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করার আইনগত কোনো সুযোগ নেই।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক'স (ন্যাশনালাইজেশান) অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ১০ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ হবে সাত সদস্যবিশিষ্ট যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্য ছয়জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন। উক্ত ছয়জন সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম তিনজনের অর্থ ব্যবস্থা, ব্যাংকিং, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প অথবা কৃষি বিষয়ক প্রমাণিত অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু বাকী তিনজনের যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অনুপোযুক্ত-অদক্ষ লোক নিয়োগের ঝুঁকি তৈরি করে এবং যা ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

৪.১.৩ খেলাপি ঋণ সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতির অনুপস্থিতি

'ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি'র সংজ্ঞা এবং উপযুক্তমাত্রায় শাস্তি নির্ধারণ না করা: বাংলাদেশের প্রচলিত আইনী কাঠামোতে সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার সংজ্ঞা[৫৮]নির্ধারিত থাকলেও ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি হিসেবে কারা চিহ্নিত হবেন, সে বিষয়ে সংজ্ঞা অদ্যবধি নির্ধারিত হয়নি। সরকার কর্তৃক খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে ঋণ খেলাপিদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি ও প্রণোদনাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ায় ঢালাওভাবে ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিরাও ভোগ করে থাকে। সরকার ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি হিসেবে কাদেরকে চিহ্নিত করা হবে, সে বিষয়ে আইনি কাঠামোতে কোন মানদণ্ড কিংবা সংজ্ঞা যেমন নির্ধারিত হয়নি তেমনি ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি হওয়াকে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও ঋণের পরিমাণভেদে শাস্তিও নির্ধারণ হয়নি। এছাড়া, ঋণের অর্থ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার (ডাইভারশন) বা সংশ্লিষ্ট ঋণের অর্থ একই গ্রুপের অন্য প্রতিষ্ঠানে সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলোও কোনো নীতিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।

উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৫ জারীকৃত ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি বিষয়ক নীতিমালায় ইচ্ছেকৃত ঋণখেলাপির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে উল্লেখ করা হয়েছে- [৫৯]

- ✓ সাধ্য থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করেনি
- ✓ যারা গৃহীত ঋণ নির্দিষ্ট খাতে ব্যবহার না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করেছে
- ✓ যাদের ঋণের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যবসায় ব্যবহার না করে সরিয়ে ফেলার পর গৃহীত ঋণের অর্থ সেই প্রকল্প বা ব্যবসার বাইরে ভিন্নতর কোনো কাজে ব্যবহার এবং
- ✓ যারা ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে বন্ধকি সম্পত্তি ব্যাংকের অজ্ঞাতসারে সরিয়ে ফেলেছে

তাছাড়া, এই নির্দেশনাও দেওয়া হযেছে যে, ইচ্ছেকৃত খেলাপিদের চিহ্নিত করতে উক্ত গ্রাহকের কোনো একক ঘটনা বা লেনদেনের ওপর ভিত্তি না করে গ্রাহকের অতীত লেনদেন ও আচরণ বিবেচনা করতে হবে।

ঋণের অর্থ অন্য খাতে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার (ডাইভারশন) বা এক ব্যবসায় থেকে সরিয়ে অন্য ব্যবসায় ব্যবহারের সংজ্ঞাও এই নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই ঋণের অর্থ অন্য খাত বা উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

- ✓ গৃহীত ঋণ থেকে স্বল্পমেয়াদি চলতি মূলধন দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করা

[৫৭] Basel committee on Banking Supervision , Core Principles for effective banking supervision, page 36, Details on- https://www.bis.org/basel_framework/standard/BCP.htm Accessed 29.12.2019

[৫৮] ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, ধারা ৫(গগ)

[৫৯] রিজার্ভ ব্যাংক অভ ইন্ডিয়া, Master circular on willful defaulter, অনুচ্ছেদ ২.১ ,সার্কুলার নং-আরবিআই/২০১৫-১৬/১০০- ডিবিআর.নং.সিআইডি.বি.সি.২২/২০.১৬.০০৩/২০১৫-১৬ , রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ১ জুলাই, ২০১৫

- ✓ মূল প্রকল্পের বাইরে ভিন্ন কোনো সম্পদ আহরণে ব্যয় করা
- ✓ যে কোনো উপায়ে গ্রুপের অন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা
- ✓ ভিন্ন কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা
- ✓ ঋণদাতা ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই অন্য কোনো কোম্পানি/কোম্পানিসমূহে বিনিয়োগ করা
- ✓ বন্টনকৃত ঋণের তহবিলে অসামঞ্জ্যতা (বরাদ্দকৃত ঋণ ও উত্তোলিত অর্থের পরিমান সামঞ্জস্যতা না থাকা)

এছাড়া, ঋণের অর্থ ব্যবসাসংশ্লিষ্ট কাজের বাইরে সরিয়ে ফেলার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, কোনো গ্রহীতা যদি ঋণকৃত অর্থ তার ব্যবসা বা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং তার জন্য যদি কোম্পানি বা ব্যাংক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট ঋণের অর্থ পাচার (siphoning of funds) হিসেবে গণ্য করা যাবে। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের কারণ হিসেবে উল্লিখিত লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হলেও ইচ্ছেকৃত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত একটি সার্বিক নীতিমালা না থাকায় ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিদের বিরূদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।[৬০]

সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তি ও গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণসীমা নির্ধারণ: একক ব্যক্তি বা গ্রুপ একটি ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কি পরিমান ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে সেটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার (একক বৃহত্তম ঋণ সীমা নীতিমালা) মাধ্যমে নির্ধারিত হলেও একক ব্যক্তি বা গ্রুপ সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাত হতে কি পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে সে বিষয়ের উল্লেখ না থাকার সুযোগে ঋণ গ্রহীতারা বিশেষত ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিরা বিভিন্ন কৌশলে, ক্ষেত্রবিশেষে পারস্পরিক সমঝোতা ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিনিয়ত অর্থ বের করে নিচ্ছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তিতে খেলাপি হয়ে পড়ছে। এছাড়া বাংলাদেশে ঋণের অর্থ অন্যত্র ব্যবহার (ডাইভারশন) বা অন্যত্র সরিয়ে ফেলার সংস্কৃতিও উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য বাংলাদেশে যদি তিনজন করে শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা খেলাপি হয় তাহলে ২১ টি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। একইভাবে ৭ জন বা ১০ জন করে শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা খেলাপি হলে যথাক্রমে ৩৫ টি এবং ৩৭ ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। [৬১]

৪.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতায় বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ: আইন ও নীতি দখল

ব্যবসায়ী ও ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে ব্যবসায়ীদের ইচ্ছে অনুসারে তাদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং নানাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশনসমূহ বারবার পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় এবং খেলাপি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪.২.১ রাজনৈতিক প্রভাবে আইন পরিবর্তন ও প্রণয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ (১০) এ কোনো একক পরিবার হতে একই সময়ে চারজন সদস্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া ১৫কক(১) ধারায় কোনো ব্যক্তির কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে একাদিক্রমে নয় বছর অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বের একক পরিবার হতে একই সময়ে দুইজন এবং দুইমেয়াদে একজন পরিচালকের সর্বোচ্চ ছয় বছর দায়িত্বপালনের সুযোগ পরিবর্তন করে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের এই সুযোগ প্রদান করা হয়।[৬২]এই সংশোধনীর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পরিচালনায় উদ্যোক্তা পরিচালকগণের পরিবারিক প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে সুসংহতকরণের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

আবার, একই ধারায় (*ধারা ১৫*) 'পরিবারের' সংজ্ঞায় পরিবারের সদস্য হিসেবে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলকে বোঝানো হয়েছে। ফলে একই পরিবারের চার জন পরিচালকের বাইরেও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে (শ্বশুর, শাশুরী, জামাতা, পুত্রবধু, মামা-ভাগনে ইত্যাদি) পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে যা পরিবারতন্ত্রকে আরও সংহত করে।

ধারা ১৫(৯) অনুসারে কোন ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে তিনজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ সর্বোচ্চ ২০ জন পরিচালক রাখার বিধান রয়েছে। বিপুল সংখ্যক পরিচালক ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার পরিপন্থি। কোনো ব্যাংকের ঋণ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন, অনুমোদন, ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিতে পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যক্ষ্য ভূমিকা থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশের ঋণ সংস্কৃতি তথা খেলাপি পরিস্থিতির অন্যমত কারণ পরিচালকদের পারস্পরিক যোগসাজশে একটি ব্যাংকের পরিচালক

[৬০] ফারুক মঈনউদ্দীন, 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি ও সুবোধ ঋণগ্রহীতা', দৈনিক প্রথমআলো, ০৭ জুলাই ২০১৯, (২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/2thDFqi

[৬১] Bangladesh Bank, Quarterly Financial Stability Assessment Report, July-September, 2019, page-23

[৬২] ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত ২০১৮), ধারা ১৫ (১০) এবং ১৫কক(১)

অন্য ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ। ফলে এই বিপুল সংখ্যক পরিচালক খেলাপি ঋণের ঝুঁকি তৈরি এবং আমনতকারীদের স্বার্থ পরিপন্থি কার্যক্রমের ঝুঁকি তৈরি করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৫৫টি ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা একে অন্যের ব্যাংক থেকে এক লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ। পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ।[৬৩]এছাড়া ঋণ মঞ্জুর, সুদ মওকুফ ও ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রেও সুবিধা নিচ্ছেন। এদিকে এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে ৫৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি অংশ রয়েছে পরিচালকদের বেনামি ঋণ। যেগুলো অবলোপনের মাধ্যমে তারা বাড়তি সুবিধা নিয়েছেন।[৬৪] উল্লেখ্য, পরিচালকদের গৃহীত ঋণের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত ঋণের কি পরিমান খেলাপি হয়েছে সে তথ্য প্রকাশিত নয়।

এছাড়া সম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে পুনঃনিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধন করে গভর্নরের বয়স সীমা ৬৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৭ বছর করা হয়।[৬৫] খেলাপি ঋণ আদায়ে সফলতা না থাকা, ঋণ নিয়ে বিদেশে টাকা পাচারের প্রবণতা বন্ধ করতে না পারা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো ইতিবাচক সংস্কার না করা, চুরি হয়ে যাওয়া রিজার্ভ ফিরিয়ে আনতে না পারা, ইত্যাদি বিষয়ক ব্যর্থতার অভিযোগ এবং ব্যাংকিং খাতে কোনো অর্জন না থাকার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ৮ জুলাই ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের চাকরির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির বিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২০ সংসদে পাস হয়।[৬৬] সাধারণত সংসদে কোনো বিল উত্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিলটি পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠায়। তবে এই বিলের ক্ষেত্রে সেটি না করে তড়িঘড়ি করেই বিলটি পাস হয়েছে।[৬৭]

৪.২.২ ব্যবসায়ী কর্তৃক নীতি দখল: প্রুডেনশিয়াল প্রবিধান সংশোধন

ব্যবসায়ীদের চাপে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশ কিছু প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানও পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো যায়, নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছেকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত আরোপ করা হয়।

ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং নীতিমালা পরিবর্তন: আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে ২০১২ সালে (বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৪) প্রণীত ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালা[৬৮] সংশোধন করে ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এই প্রবিধান প্রণয়ন করে যেখানে শ্রেণিবদ্ধ ঋণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত সংজ্ঞায় শ্রেণিকৃত ঋণের (চলমান, চাহিদা ভিত্তিক, নির্দিষ্ট মেয়াদি) সংজ্ঞা পরিবর্তন করে প্রতিধাপে তিনমাস করে সময় বৃদ্ধি করা হয় তথা 'তিন মাস বা ততোধিক কিন্তু নয় মাসের কম হলে নিম্নমান', 'নয় মাস বা ততোধিক কিন্তু ১২ মাসের কম হলে সন্দেহজনক' এবং '১২ মাস বা ততোধিক হলে মন্দ/কু ঋণ' হিসেবে বিবেচিত হবে। নতুন নিয়মে মেয়াদি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। কোনো একজন গ্রাহকের মেয়াদি ঋণের ছয়টি মাসিক কিস্তি অপরিশোধিত থাকার পর আরও তিন মাস অনাদায়ী থাকলে সেটা নিম্নমান হিসেবে বিবেচিত হবে। পরিশোধের প্রথম ছয় মাস পার হওয়ার পর তিন থেকে নয় মাস পর্যন্ত তা নিম্নমান ধরা হবে। আর ব্যাংক কোম্পানি আইনে যেহেতু ছয় মাস মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ খেলাপি বিবেচিত হয়, ফলে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের একটি ঋণ ১২ থেকে ১৫ মাস পর্যন্ত নিম্নমান বিবেচিত হবে। ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় অর্ধেক মেয়াদি ঋণ এবং খেলাপি হওয়া ঋণের বড় অংশই মেয়াদি ঋণ।[৬৯] ফলে খেলাপি ঋণের বড় একটি অংশ ১২ থেকে ১৫ মাস আদায় না হলেও তা খেলাপি হবে না এবং এর বিপরীতে ব্যাংকে দীর্ঘ সময় তাদের মুনাফা থেকে কোনো প্রভিশন রাখতে হবে না। এছাড়া শ্রেণিকৃত (খেলাপি) ঋণের সংজ্ঞায় এই পরিবর্তন কাগজে-কলমে খেলাপি ঋণ হ্রাস করবে এবং ঋণ খেলাপিদের জন্য বাড়তি প্রণোদনা। ঋণ শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রণীত পূর্বোক্ত নীতি (বিআরপিডি সা.-১৪/২০১২) থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই উল্টোযাত্রা ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিদের উৎসাহিত করছে এবং নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাদের খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে।

---

[৬৩] তারকা চিহ্নিত প্রশ্নত্তোর- ৪৭১, পৃষ্ঠা নং- ০৮-১১, ২২ জানুয়ারি ২০২০, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তরদানের প্রশ্ন ও উত্তর, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বুলেটিন।

[৬৪] দৈনিক যুগান্তর, ব্যাংকে পরিচালকদের আগ্রাসী থাবা, ঋণ পৌনে দুই লাখ কোটি টাকা, ২৯ জানুয়ারি ২০২০, (২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/2GOp4Ws

[৬৫] শওকত হোসেন, যে গভর্নরের জন্য আইন বদলাতে হলো, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/opinion/column/

[৬৬] দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন - https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1667929/

[৬৭] দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন - https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1667929/

[৬৮] ঋণের কিস্তি তিন মাস অনাদায়ী হলে সাব-স্ট্যান্ডার্ড, ছয় মাস অনাদায়ী হলে সন্দেহজনক এবং নয় মাস মেয়াদোত্তীর্ণ হলে মন্দমানের খেলাপি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হবে।

[৬৯] দৈনিক সমকাল, ঋণখেলাপি হওয়ার সময়সীমা বাড়লো, ২৩ এপ্রিল, ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/19044099/

খেলাপি ঋণ অবলোপন নীতিমালা: দীর্ঘমেয়াদে আদায় অযোগ্য খেলাপি হয়ে যাওয়া ঋণসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মূল ব্যালান্সশিট থেকে সরিয়ে আলাদা আরেকটি লেজারে হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থাই হলো ঋণ অবলোপন। অবলোপনের অত্যবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো- উক্ত ঋণ সুদসহ আদায়ের জন্য ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করবে এবং যে পরিমাণ ঋণ অবলোপন করা হয়, তার সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা সঞ্চিতি হিসেবে রাখতে হবে। নিরাপত্তা সঞ্চিতির অর্থ হলো ওই পরিমাণ অর্থ ব্যাংক কর্তৃক অন্য কাউকে ঋণ দেওয়া যাবে না; এর ফলে ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ সঞ্চিতি হিসেবে রাখবে ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার সামর্থ্য ওই পরিমাণই সংকুচিত হয়ে যাবে। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নীতিমালার (বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১) মাধ্যমে ঋণ অবলোপন করার ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণের সময়কাল হ্রাস করা হয়। পূর্বের নীতিমালা অনুসারে পাঁচ বছরের[৭০] স্থলে তিন বছর হলেই মন্দমানের খেলাপি ঋণ মামলা ছাড়াই [দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত] অবলোপন করা যাবে, তবে ঋণের পরিমাণ এর বেশি হলে মামলা করতে হবে। আবার অবলোপন করার জন্য আগের মতো শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ঋণ থেকে স্থগিত সুদ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট স্থিতির সমপরিমাণ নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হবে। আগে পুরো দায়ের বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হতো। এর ফলে ঋণ আদায় না হলেও কাগজ-কলমে খেলাপি ঋণ কমবে। এবং শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতি না রাখার বিধানের ফলে ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তৎপরতাও হ্রাস পাবে।

ঋণ আমানত অনুপাত (এডিআর)/বিনিয়োগ-আমানত হার (আইডিআর) সীমা বৃদ্ধি: ঋণ আমানত অনুপাত হলো উক্ত সময়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত আমানতের পরিমাণ সাপেক্ষে বিতরণ উপযোগী ঋণের পরিমাণ (শতাংশ) যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত। ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমে এটি বিনিয়োগ-আমানত হার (আইডিআর) নামে পরিচিত । বাংলাদেশ ব্যাংক ডিওএস সার্কুলার নং-০৫ (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) অনুসারে প্রচলিত ধারার ব্যাংকের জন্য অগ্রিম-আমানত হার (এডিআর) সর্বোচ্চ ৮৫.০ শতাংশ এবং ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ-আমানত হার (আইডিআর) সর্বোচ্চ ৯০.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমাগত ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং খেলাপি ঋণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শৃংখলা স্থাপনের একটি উদ্যোগ হিসেবে ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন (ডিওএস সার্কুলার- ০১) জারীর মাধ্যমে ঋণ আমানত অনুপাত হার সীমা ৮৩.৫% এবং বিনিয়োগ-আমানত হার সীমা ৮৯% নির্ধারণ করে এবং এই সীমার বাইরে থাকা ব্যাংকসমূহকে (তৎকলীন সময়ে ১৪টি[৭১]) ৩০ জুন, ২০১৮-র মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তিতে আরও তিন দফা সময় বৃদ্ধি তথা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাংক (মার্চ,২০১৯ পর্যন্ত ১৯টি)[৭২] বাংলাদেশ ব্যাংকের এই আদেশ মানতে ব্যার্থ হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে দৃষ্টান্তমূলক কিংবা দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ঋণ আমানত অনুপাত হার ও বিনিয়োগ-আমানত হার সীমা বৃদ্ধি করে সর্বশেষ সার্কুলার জারি করা হয়। তারপরও আগ্রাসি ব্যাংকিং নীতির কারণে ১০ টি[৭৩] ব্যাংক ঋণ আমানত অনুপাত সীমা লঙ্ঘন করেছে। নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সীমিত হয়ে পড়ার পেক্ষাপটে সাগগ্রিকভাবে বেসরকারি খাতে আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহে গতিশীলতা আনয়ন, ব্যাংকিং খাতে সার্বিক তারল্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়নের যুক্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিওএস সার্কুলার ০২ (১২ এপ্রিল ২০২০)-র মাধ্যমে প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ক্ষেত্রে অগ্রিম আমানত হার (এডিআর) দুই শতাংশ বাড়িয়ে ৮৭.০ শতাংশ এবং শরীয়াহ ভিত্তিক-ইসলামী ধারার ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ আমানতের হার (আইডিআর) দুই শতাংশ বাড়িয়ে ৯২.০ শতাংশ নির্ধারণ করে।[৭৪] তা সত্ত্বেও আগস্ট ২০২০ অবধি ১১টি ব্যাংক ঋণ-আমানত অনুপাত নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে।[৭৫] বিষয়টি ব্যাংকিংখাতে সুশাসন চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাছাড়া, ব্যংকসমূহের একাংশের ঋণ আমানত অনুপাত সীমার বাইরে থেকে যাওয়া সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন: ১৬ মে ২০১৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নীতিমালার (বিআরপিডি সার্ককুলার নং- ০৫) মাধ্যমে ঋণ খেলাপিদের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ করা হয়। ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে নগদে ন্যূনতম দুই শতাংশ এককালীন পরিশোধ অর্থাৎ ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে বকেয়া ঋণের দুই শতাংশ টাকা নগদ জমা দিয়েই ঋণ নিয়মিত করা যাবে। এতে সুদ হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ এবং এক বছরের ঋণ পরিশোধে বিরতিসহ ১০ বছরের মধ্যে বাকি টাকা পরিশোধ করা যাবে। আবার ব্যাংক থেকে নতুন করে ঋণও নিতে পারবে। এসময়ে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায়ে চলমান মামলা (যদি থাকে) কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। আবার এককালীন এক্সিটের ক্ষেত্রে, বকেয়া ঋণের দুই শতাংশ টাকা

[৭০] ঋণ অবলোপন এর নীতিমালা, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, ১৩ জানুয়ারী ২০০৩।

[৭১] এখনও সীমার বেশি এডিআর ১৯ ব্যাংকে, দৈনিক সমকাল, ১৩ জুন ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/32xP95k

[৭২] দৈনিক সমকাল, এখনও সীমার বেশি এডিআর ১৯ ব্যাংকে, ১৩ জুন ২০১৯ (২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/32xP95k

[৭৩] দৈনিক প্রথম আলো, ঋণ দেওয়ার সুযোগ বাড়ল ব্যাংকের, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, (২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/2BqYwrV

[৭৪] দৈনিক প্রথম আলো, ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার সীমা বাড়ল, ১২ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/

[৭৫] ১১ ব্যাংকের 'সীমা লঙ্ঘন', অনলাইন গনমাধ্যম সারাবাংলা.নেট, ২৫ আগস্ট ২০২০ (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: https://sarabangla.net/post/sb-460762/

নগদ জমা দিয়ে, সুবিধা গ্রহণ কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে ৩৬০ দিনের মধ্যে তহবিল খরচের সমান সুদ দিয়েই বাকি টাকা শোধ করতে পারবেন। এসময়ে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায়ে চলমান মামলা (যদি থাকে) কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।[৭৬]

এছাড়া ২০১৮ সালে সুদহার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার কথা বলে বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তারা রাজনৈতিক প্রভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে চার ধরনের সুবিধা নিয়েছিলেন। বিএবির চাহিদা অনুযায়ী সরকারি আমানতের ৫০ শতাংশ বেসরকারি ব্যাংকে রাখা, সিআরআর এক শতাংশ হ্রাস; ঋণ আমানতের হার (এডিআর) সমন্বয়সীমার সময় বাড়ানো এবং রেপো রেট ৬.৭৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ করা হয়েছে। তারপরও ঋণের সুদহার বেড়েছিল,[৭৭] তবে পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার (বিআরপিডি সার্কুলার -০৩/২০২০, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০) জারি করে **১** এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারন করে দেয়।

ইন্টার্নাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং' শিথিলকরণ: কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। প্যাকেজ বাস্তবায়নে অর্থাৎ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণা (বিআরপিডি সার্কুলার-৮, ১২ এপ্রিল ২০২০ এবং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, ১৩ এপ্রিল ২০২০) অনুযায়ী, ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে গাইডলাইনস অন ইন্টারন্যাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সিস্টেম ফর ব্যাংকস (আইসিআরআরএস) অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর তথ্যের ভিত্তিতে রেটিং ন্যূনতম 'মার্জিনাল'[৭৮](গ্রাহকের স্কোর হতে হবে অন্যূন ৬০-অনুর্ধ ৭০ শতাংশ অর্থাৎ গ্রাহক নাজুক হলেও ঋণ ফেরতের নূন্যতম সক্ষমতা রয়েছে) হওয়ার পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে অপর একটি সার্কুলার (বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৫, ১০ মে, ২০২০ ও এসএমইএসপিডি সার্কুর্লার লেটার নং- ৩, ১২ মে ২০২০) জারি করে এই শর্ত শিথিল করে উল্লেখ করা হয় যে, আইসিআরআরএস-এর কাজ সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ, এ কারণে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিআরআরএস অনুযায়ী রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন না করে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে, প্রতিটি ব্যাংক বিদ্যমান নিজস্ব নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করবে। এভাবে করোনা পরিস্থিতিতে 'ইন্টার্নাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং' কে শিথিল করে ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

উল্লিখিত আইন ও নীতিসমূহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থে সংশোধন করা হয়েছে; যা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধিতে সহায়ক, ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহিত করে। সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনের ইচ্ছায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একটি বাণিজ্যিক হোটেলে বসে সভা করে অগ্রিম আমানত অনুপাত (এডভ্যান্স ডিপোজিট রেশিও), নগদ জমা সংরক্ষণ (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও-সিআরআর) হ্রাস করেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে হোটেলে বসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক নীতির পবির্তন একটি নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অভিহিত করা হয়। এটি গ্রাহক স্বার্থের পরিপন্থি হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক বাহ্যিক প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করে।

বিগত কয়েক বছরে একদিকে খেলাপি ঋণ আদায়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের ঘোষণা অন্যদিকে খেলাপি ঋণ আদায়ের নামে ইচ্ছেকৃত, প্রভাবশালী ও বৃহৎ ঋণ খেলাপিদের জন্য প্রণোদনামূলক এইসকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। যারা নিয়মিত ঋণ গ্রহীতা তাদের চেয়ে ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিদের অধিক সুবিধা দেওয়ায় নিয়মিত গ্রহাকদের খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। এ সুযোগ খেলাপি ঋণের একটি বৃহৎ অংশ নথিগতভাবে নিয়মিত হয়ে যাওয়ায় কৃত্রিমভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে চলমান মামলা স্থগিত হওয়া ও ঋণ খেলাপির তাকমামুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিরা বিভিন্ন ব্যাংক হতে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যা পূর্বের মতোই আবার খেলাপি হয়ে যাওয়ার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

৪.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতায় বাহ্যিক প্রভাব/হস্তক্ষেপ: ব্যাংক খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে সব সময়ই এক শ্রেণির ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যাংকিং খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষ করা গেছে। একটি গবেষণায় দেখানো হয় যে, রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরষ্কার হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে ব্যবসায়ী-শিল্পগ্রুপ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যাংক ঋণ বা ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।[৭৯] সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত গত এক দশকে এই প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী ও শিল্পগ্রুপ বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ব্যাংক খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ এবং ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঋণকে ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি করার এই চেষ্টাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

[৭৬] দৈনিক প্রথম আলো, খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য বড় ছাড়, ১৬ মে ২০১৯, (২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সংগৃহীত), বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/30YbSaS

[৭৭] বাংলা ট্রিবিউন, নির্বাচনের বছরেও সুদহার এক অঙ্কে নামছে না, ৪ জুন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/business/news/330721/

[৭৮] গাইডলাইনস অন ইন্টারন্যাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সিস্টেম ফর ব্যাংকস (আইসিআরআরএস), বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা ০৬-০৭, দেখুন - https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/brpd/guidellines_on_%20icrs_2019.pdf

[৭৯] Dr. Moinul Islam and Mohiuddin Siddique, A Profile of Bank Loan Default in the Private Sector in Bangladesh, 2010, Chittagong, Bangladesh

করা হচ্ছে। ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধাপসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

৪.৩.১ রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স অর্জন

নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সকল এলাকা এখনও ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত অবশ্যই সেই এলাকায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করে নতুন ব্যাংকের জন্য অনুমোদন দেওয়া উচিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির সুযোগ তৈরি এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের যে নতুন ব্যাংকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এগুলোর অধিকাংশ শাখাই নগর কেন্দ্রিক। যে এলাকায় একাধিক ব্যাংকের শাখা রয়েছে সেখানে নতুন একটি ব্যাংকের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি পায় না। উল্টো ঋণ প্রদানে এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হওয়ার ফলে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই ঋণ গ্রহীতাকে একাধিক ব্যাংক ঋণ দেওয়ার ফলে খেলাপি হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মতে, বাংলাদেশে সমসাময়িক অর্থনৈতিক পেক্ষাপটে নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ২০০৯ সালের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি আমলে না নিয়ে সরকার মোট ১৪টি ব্যাংকের অনুমোদন দিতে বাধ্য করে। যদিও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের হলেও সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থনীতির স্বার্থ কিংবা জনগণের আর্থিক লেনদেনের যুক্তি বা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক অনুমোদন দেওয়া হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় লাইসেন্স পাওয়া এসকল ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মী, ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতা, মন্ত্রী ও সাংসদের পরিবারের সদস্য, দলীয় মতাদর্শের বিভিন্ন পেশাজীবী ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি পেশাজীবী গ্রুপের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। যেমন, পুলিশ ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে এমনকি ভারত বা পাকিস্তানেও বিশেষ কোনো পেশাজীবীদের আলাদা করে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেওয়া হয় না, যেখানে জনগনের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ভারতে পেশাজীবীদের জন্য পৃথক ক্রেডিট ইউনিয়ন করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু সংশ্লিষ্ট পেশার বর্তমান বা সাবেক কর্মজীবীরা উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নে অর্থ সঞ্চয় করতে পারে।

নতুন ব্যাংকের ইক্যুইটি ক্যাপিটালের বিনিয়োগকৃত অর্থ আয়কর রিটার্নে ঘোষিত সম্পদ থেকে পরিশোধের বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে 'কালো টাকা' বিনিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৩ সালে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন পাওয়া একটি ব্যাংকের ৩৯ জন উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছাত্রনেতা ১০ লাখ শেয়ারের মালিক ছিলেন যার মূল্য এক কোটি টাকা। এই বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩.২ শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তরের মাধ্যমে পারিবারিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

একক বা যৌথভাবে কোনো ব্যাংকের শতকরা দশভাগের বেশী শেয়ার ক্রয় না করার বিধান থাকলেও বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নামে-বেনামে কতিপয় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি কর্তৃক অধিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেহেতু সংজ্ঞা অনুযায়ী শাশুড়ি একই পরিবারের সদস্য নয়, সেহেতু আইনের এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে একটি ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা তার শাশুড়ির নামে শেয়ার কিনে উক্ত ব্যাংকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল ব্যাংকের অন্য উদ্যোক্তা, শেয়ার হোল্ডারগণ এবং পরিচালকেরা শুধু নামমাত্র থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার বিক্রয়ে বাধ্য করা হয়। একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংকের ২৮ শতাংশ শেয়ার ক্রয় এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের নামে অপর একটি ব্যাংকের ১৪ শতাংশ শেযার ক্রয়। এভাবে উক্ত ব্যবসায়ী কর্তৃক নয়টি ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে উক্ত ব্যবসায়ী বা শিল্পগ্রুপকে সহায়তা করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উক্ত ব্যবসায়ীর একটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ব্যবস্থাপনায় রদ-বদল প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৪.৩.৩ পরিচালনা পর্ষদ নিয়ন্ত্রণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠনে আইনের লঙ্ঘন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে পরিচালনা পর্ষদ গঠনে বা পরিবর্তনে আইনের ব্যাপক লঙ্ঘন লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনও নেওয়া হয় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুমোদন দিতে বাধ্য করা হয়। বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিচালনা পর্ষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি গ্রুপ কর্তৃক পূর্ব থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। সাধারণ সভা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ সভায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন একজন সাংসদ একটি ব্যাংকের সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে তার প্রভাব খাটিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে দিয়ে আসে। এছাড়া একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়।

একক পরিবারের পরিচালক সীমা লঙ্ঘন

আইন সংশোধনের মাধ্যমে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের দুইজনের স্থলে সর্বাধিক চারজন পরিচালক রাখার বিধান করার পরও একাধিক ব্যাংক কর্তৃক এই আইন লঙ্ঘনের মাধ্যমে চার জনের অধিক পরিচালক রাখার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বামী, স্ত্রী, দুই পুত্র, মেয়ে ও নাতিসহ একই পরিবারের মোট ছয় জন সদস্য পরিচালক হিসেবে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইনে উল্লিখিত পরিবারের সংজ্ঞার যে দুর্বলতা তার সুযোগ নিয়ে আইনের এই লঙ্ঘন করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করে থাকে।

অযোগ্য ও অদক্ষ পরিচালক নিয়োগ

বিশ্বব্যাপী ব্যাংক পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন বিশেষজ্ঞ, দক্ষ ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার চর্চা লক্ষ করা গেলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং পরিচালক নিয়োগের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত নীতিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ না করে ব্যাংক/ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত পরিচালক নিয়োগের গাইডলাইনে পরিচালক হওয়ার জন্য ব্যাংক/ব্যবস্থাপনা বা পেশাগতভাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিও লক্ষ করা যায়। একটি ব্যাংকে দেখা যায়, পরিবারের এমন একজনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যার শিক্ষাজীবন মাত্র শেষ হয়েছে। যার শিক্ষা জীবন মাত্র শেষ হয়েছে তার দশ বছরের অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে ব্যাংকের পরিচালকগণ আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং অনেক সময় উক্ত বিষয়ে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা হয়।

ঋণ খেলাপি পরিচালক নিয়োগ

ব্যাংক কোম্পানী আইনে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি কোনো ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবে না এমন সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও তা লঙ্ঘন করে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক ঋণ খেলাপি পরিচালক হিসেবে রয়েছেন। যদিও তাদের অনেকের খেলাপি ঋণ বারবার পুনর্গঠন/পুনঃতফসিল করে নিয়মিত দেখানো হয়। একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ১৭-১৮টি ব্যাংক থেকে প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা ঋণ নেন যার মধ্যে ৫০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ। এই খেলাপি ঋণ ২০১৫ সালে পুনর্গঠিত করার পর আবার খেলাপি হয় এবং যা সম্প্রতি পুনরায় পুনর্গঠন করা হয়েছে।[৮০] জাতীয় সংসদ হতে প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাংক পরিচালকদের ঋণের পরিমাণ এক লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা এবং পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা।[৮১] তবে পরিচালকদের খেলাপি ঋণের তথ্য প্রকাশ করা হয় না। তারা নিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ ও ঋণ পুনঃতফসিলের সুবিধা নিচ্ছেন। মোট অবলোপন করা ঋণের একটি অংশ হিসেবে রয়েছে পরিচালকদের বেনামি ঋণ।[৮২]

৪.৩.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি ও নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে অনুগত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ

একটি ব্যাংকের পরিচালকগণ নীতি নির্ধারণী কাজ করে থাকে। সরাসরি ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাংকিং কার্যক্রমে সর্বাচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ব্যাংকিং কার্যক্রমে পরিচালকদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকার কারণে তারা তাদের অনুগত নির্বাহী নিয়োগ করতে বিভিন্নভাবে আইনের লঙ্ঘন করে থাকে। কখনও কখনও নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতিও সংঘটিত হয়ে থাকে। একটি ব্যাংকে কর্মরত থাকা অবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তিকে অপর একটি ব্যাংক প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ দেয়।[৮৩]এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আপত্তি করলেও তাদের আপত্তি উপেক্ষা করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ ও অপসারণ নীতিমালা অনুসরণ না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন না নিয়েই পর্ষদের ইচ্ছে অনুসারে প্রধান নির্বাহীদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। একটি ব্যাংকে পরিচালকদের চাপে তিন বছরে তিনজন এমডি পদত্যাগ করে। ব্যাংক কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ তিন মাসের বেশী শূন্য না রাখার বিধান থাকলেও একটি ব্যাংকে দুই বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।[৮৪] বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০১৫ সাল থেকে ৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫টি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা

[৮০] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুযারী, ২০১৮

[৮১] তারকা চিহ্নিত প্রশ্নোত্তোর- ৪৭১, পৃষ্ঠা নং- ০৮-১১, ২২ জানুয়ারি ২০২০, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তরদানের প্রশ্ন ও উত্তর, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বুলেটিন।

[৮২] ব্যাংকে পরিচালকদের আগ্রাসী থাবা, ঋণ পৌনে দুই লাখ কোটি টাকা, দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: http://bit.ly/2GOp4Ws

[৮৩] দৈনিক যুগান্তর, ঝুঁকিতে ন্যাশনাল ব্যাংক, ১৩ জানুয়ারি ২০১৮, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/6087/

[৮৪] দৈনিক যুগান্তর, প্রাগুক্ত

প্রধান নির্বাহী নিয়োগ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কোনো ধরনের দণ্ড প্রদান না করে শুধুমাত্র সতর্ক করে দেয়।[৮৫]

৪.৩.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ: ব্যাংকিং খাতের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম সীমিতকরণ

> **"বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চারজন অভিবাবক আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বালাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এবং ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন।" -বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সাবেক ডেপুটি গভর্নর**

ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক হলেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা কার্যকর নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে নীতি নির্ধারনী, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে দ্বৈত তদারকি ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে প্রভাবশালী ব্যাংক এসোসিয়েশন বা ব্যবসায়ীরা নানাভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংককে সরাসরি প্রভাবিত করা কঠিন। এই জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে আবার সক্রিয় করা হয়েছে। এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে উভয়ের যৌথ তদারকির সাথে সাথে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমেও এই বিভাগ হস্তক্ষেপ করে থাকে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে অপসারণ ঠেকানো, নিয়োগ পদায়ন বা অপসারণ বিষয়ে বাংলাদশ ব্যাংকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর অর্থমন্ত্রণালয় হস্তক্ষেপ করে থাকে। যেমন, অনিয়ম-দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে অপসারন না করে ব্যাংকটিতে নতুন করে মূলধন যোগান দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং পরবর্তিতে উক্ত ব্যক্তি পদত্যাগ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

৪.৩.৬ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেও অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি লক্ষণীয়। বাংলাদেশ ব্যাংকস ন্যাশনালাইজেশন অর্ডারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ছয় জন পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনজনের যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও বাকী তিন জন পরিচালকের যোগ্যতা বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয় নি।[৮৬] আইনের এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। একাদশ জাতীয় সংসদে দুইটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দুইজন সাংসদ পরিচালক হিসেবে ছিলেন; এছাড়া বিগত দশ বছরে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের একাধিক ছাত্রনেতা ও যুব নেতাদের ব্যাংক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার নজির রয়েছে। এবং কয়েকটি বৃহৎ ঋণ অনুমোদন এবং পরবর্তীতে তা খেলাপি হওয়ার ঘটনায় তাদের প্রভাব আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশ সত্ত্বেও একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে অপসারণ না করানোর নজিরও লক্ষ করা গেছে।

৪.৩.৭ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ উপেক্ষা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অনিয়মের অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু তাদের আপত্তিকে উপেক্ষা করে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাকে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়। অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি শাখার একজন মহাব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে একটি বহুল আলোচিত ব্যাংক কেলেঙ্কারীতে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ সত্ত্বেও তাকে পদোন্নতি দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উক্ত নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতিও সংঘঠিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ ঋণ খেলাপি এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে ও রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে অথবা মন্ত্রণালয়ের একাংশের কর্মকর্তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৪.৩.৮ যোগসাজশ/সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও খেলাপি দায় এড়ানো:

কতিপয় ব্যবসায়ী-শিল্পগ্রুপ, তাদের নিযুক্ত পরিচালক ও উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির পারস্পরিক যোগসাজশ/ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৫৫টি ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা একে অন্যের ব্যাংক থেকে এক লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ। পরিচালকদের যার যার নিজ ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। [৮৭]এছাড়া

---

[৮৫] এই গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য অধিকার আইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[৮৬] বাংলাদেশ ব্যাংক'স (ন্যাশনালাইজেশান) অর্ডার, ১৯৭২, ধারা ১০

[৮৭] জাতীয় সংসদ, প্রাগুক্ত

এসকল ব্যাংক পরিচালকের বিরুদ্ধে বেনামেও প্রচুর ঋণ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।[৮৮] এসকল ঋণের মধ্যে পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খেলাপি হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে এই খেলাপি ঋণ তাদের প্রভাবের মাধ্যমে বারবার সুদ মওকুফ ও ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন, ঋণ অবলোপন ইত্যাদি বাড়তি সুবিধা নেয়া হয়েছে।

৪.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে নানাভাবে প্রভাবিত করা হয়।

৪.৪.১ আমলা নির্ভর পরিচালনা পর্ষদ

আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি খুবই কম। কোনো কোনো দেশে তাদের উপস্থিতি থাকলেও পর্ষদে তাদের ভোটাধিকার রাখা হয় না। আইনে উল্লেখ করা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পর্ষদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহ যথা নেপাল[৮৯]ও শ্রীলংকার[৯০] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে একজন করে সরকারি কর্মকর্তা এবং ভারতের[৯১] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে দুইজন সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তা রাখা হয়েছে। এছাড়া দুইজন সাবেক আমলা এই পর্ষদে রাখা হয়েছে যা পরিচালনা পর্ষদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৪.৪.২ সরকারের পছন্দ মাফিক গভর্নর নিয়োগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর, খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গভর্নর নিয়োগ বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। যারা গভর্নর নিয়োগের নীতিমালার আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যোগ্য ও উপযুক্ত গভর্নর পদপ্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করে এর মধ্যে থেকে গভর্নর নিয়োগের জন্য সরকারকে সুপারিশ করে এবং সরকার এই সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নর নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে গভর্নর নিয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পছন্দ মাফিক এবং সরকারের অনুগত গভর্নর নিয়োগ করা হয় যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের বিরোধিতা না করে।

> **"বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন গভর্নর পদত্যাগের মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে নতুন একজন গভর্নরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। যার ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ট হওয়ার কারণে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় "- একজন মূখ্য তথ্যদাতা**

৪.৪.৩ পছন্দমাফিক ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দিয়ে থাকে। গভর্নরের মতো ডেপুটি গভর্নর নিয়োগেরও সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। তবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। এই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়। একটি কমিটির সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যানকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। অর্থাৎ যাকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা হবে সেই নির্ধারণ করে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কে করবে। এই কমিটি ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের যে সুপারিশ করে তার মধ্যে দু'জনের নামে দুদকে অভিযোগ থাকায় সরকার তা গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বয়স সীমা একমাস বৃদ্ধি করে নতুন একজনকে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রভাবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করা হয় যার ফলে উক্ত শিল্পগ্রুপের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রযোজনমাফিক দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৪.৪.৪ তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলে শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোনে চাপ প্রয়োগ করে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাপ দেওয়ার জন্য তার পুরাতন কিছু হিসেবের মধ্যে থেকে ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করে সামনে নিয়ে আসা হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়ার ভয়ে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না।

৪.৪.৫ তদারকি কাজে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ: আইন প্রয়োগে কঠোর হতে বাধা

---

[৮৮] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, মিলেমিশে ঋণ উৎসব ব্যাংক পরিচালকদের, ২৬ জানুয়ারি, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/01/26/867079

[৮৯] নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক অ্যাক্ট, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nrb.org.np/category/acts/?department=lgd

[৯০] সেন্ট্রল ব্যাংক অব শ্রীলংকা, মানিটারি ল অ্যাক্ট, ২০১৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/acts/legislative-enactments

[৯১] রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৪, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIA1934170510.PDF

ব্যাংক উদ্যোক্তা বা ব্যাংকের লাইসেন্স পাওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের অংশ বা সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মকারী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর না হয়ে ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে ১৭ জন সাংসদ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালক পদে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদমর্যাদা দিক থেকে (warrant of precedence) সাংসদ ও মন্ত্রীর নীচে অবস্থান করার কারণে তাদের প্রতি গভর্নর কঠোর হতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিগত পাঁচ বছরে পাঁচটি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠনে অনিয়ম করলেও তাদের শুধুমাত্র সতর্ক করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও উক্ত ব্যাংকের পরিচালকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। রাজনৈতিক প্রভাবে আইন অনুযায়ী কাজ করতে না পারার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময় ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অনুকূলে যায় এবং আমানতকারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত থাকে। ঋণ আমনত অনুপাত সীমার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ভঙ্গ করে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেনি। ব্যাংকিং খাতে এত অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো অনিয়মের অভিযোগে কোনো ব্যাংকের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাউকে অপসারন করেনি। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রায় সবাই চলতি দায়িত্ব শেষে নিজের দায়িত্বের মেয়াদবৃদ্ধি বা বিকল্প লাভজনক কোনো পদে আসীন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কোনো ব্যাংকের পরিদর্শনে বড় ধরনের খেলাপি ঋণ সম্পর্কিত কোন অনিয়ম চিহ্নিত করলেও উক্ত ব্যাংককে শুধুমাত্র কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করার জন্য বলা হয়। এবং উক্ত অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তির শাস্তির সুপারিশ করা হয়। অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কোনো না কোনোভাবে দুর্দশাগ্রস্থ ব্যাংকে বাচিয়ে রাখতে হয়। একটি ব্যাংক বন্ধ হলে তার নেতিবাচক প্রভাব সমস্ত অর্থনীতির ওপরেই পড়বে। কিন্তু প্রণোদনা প্রাপ্তির মাধ্যমে বেচে থাকা ব্যাংকগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর হয় না। ফলে ঐ ব্যাংকগুলোও নিশ্চিত থাকে যে, যতই অনিয়ম হোক, ব্যাংকতো চালু থাকবেই। ফলে ব্যাংকগুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত থাকে।

সরকার খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ইচ্ছেয় তাদের অনুকূলে বারবার আইন ও নীতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। ব্যাংকিং প্রবিধান, নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রমশই আন্তর্জাতিক অনুকরণীয় চর্চা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এছাড়া ব্যাংকিং খাতে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন তদারকি কার্যক্রমে বারবার রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভূমিকাকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতি মাধ্যমে কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে যা নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকেও খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে।

পঞ্চম অধ্যায়:
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত করে যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন, ব্যাংকসমূহকে উক্ত বিধি-বিধানসমূহ পালন করতে বাধ্য করা এবং এক্ষেত্রে আইনের কোনো ব্যত্যয় হলে তার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু এই গবেষণার বিশ্লেষণী কাঠামোয় উল্লিখিত সুশাসনের সূচকের আলোকে বিশ্লেষিত প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপের পাশাপাশি কিছু অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জে রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি, তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি এবং তদারকি কাজে সংঘটিত অনিয়ম দুর্নীতি। যেসব চ্যালেঞ্জ ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

৫.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি

রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংক অনুমোদন, ব্যবসায়ীদের চাপে বারবার ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, ব্যাংক পরিচালক ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় বিগত এক দশকে ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বা বাহ্যিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যবসায়ী গ্রুপের চাপের কাছে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নদের নমনীয়তা লক্ষ করা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে দুর্বল নের্তৃত্ব ও সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাটুকুও চর্চা করা হয় না।[৯২] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপের নজির লক্ষ করা গেলেও সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও পূর্বের গভর্নরদের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ রয়েছে। সমঝোতার মাধ্যমে অনৈতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগে ৩৪ জন ব্যাংক পরিচালককে অপসারণ,[৯৩]একটি ব্যাংকের পর্ষদে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে সম্পূর্ণ পর্ষদ বাতিল করা এবং পরবর্তীতে অর্থমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে বললেও তা গ্রহণ না করা[৯৪] ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে দেখালেও এ ধরনের উদ্যোগ বর্তমানে খুব একটা দেখা যায়না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রভাবশালিদের মর্জি মেনে নেওয়া হয়।

> "আমি তখন ডেপুটি গভর্নর। হঠাৎ শুনলাম একটি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের সভায় গোলাগুলি হচ্ছে। পুলিশের মাধ্যমে জানা গেল ঘটনাটি সত্য। তখনকার গভর্নর....বললেন, ...পর্ষদ ভেঙে দেন। আমরা আইন অনুযায়ী, আধা ঘন্টার মধ্যে পর্ষদ ভেঙে দিলাম। তখন অর্থমন্ত্রী ফোন করে বললেন, আপনারা পর্ষদ ভেঙে দিলেন। আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে কি খুব অসুবিধা হতো। আমি বললাম, আপনাকে বললে পর্ষদ ভাঙা যেত না। আপনি রাজনীতি করেন। উনি জানতে চাইলেন, সিদ্ধান্ত স্থগিত করবেন নাকি। গভর্নর জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্থগিত করা হবে না। তাহলে তো বাংলাদেশ ব্যাংক থাকে না। একটি ব্যাংকের পর্ষদে মারামারি হবে, আর বাংলাদেশ ব্যাংক চেয়ে চেয়ে দেখবে, তা তো হয় না। - একজন সাবেক ডেপুটি গভর্নর।

৫.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি

পরোক্ষ তথ্য বা পূর্ববতী গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যাংক তদারকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। এক, সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে পরিদর্শন করা যাকে অনসাইট সুপারভিশন বলে এবং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাংকের অবস্থা বিশ্লেষণ যাকে অফসাইট সুপারভিশন বলা হয়। এই গবেষণায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এই দুই ধরনের তদারকি সক্ষমতার কিছু ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যা ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের একটি অন্যতম কারণ।

৫.২.১ তদারকি কাজে জনবল সংকট: বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট সুপারভিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে ঘাটতি রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে এবং অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে ব্যাংকিং পরিদর্শন বিভাগের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-১ এবং ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন-২ বিভাগে একত্রে ৪৫.৭ শতাংশ প্রথম শ্রেণির পদ শূন্য রয়েছে এবং অফ সাইট সুপারভিশনে ৩৬.৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে।

---

[৯২] বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২, ধারা ১০ (২), বিস্তারিত দেখুন: https://www.bb.org.bd/aboutus/bankregulations/bbankorder.pdf, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[৯৩] দৈনিক কালের কণ্ঠ, নিজেদের মধ্যে ঋণ ভাগাভাগি ব্যাংক পরিচালকদের, ২৪ মে ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2018/03/15/639800

[৯৪] দৈনিক প্রথম আলো, বিশেষ সাক্ষাৎকার: ইব্রাহিম খালেদ, ব্যাংক রাজনীতির জায়গা না, জবাবদিহিও নেই, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/

চিত্র ৪: বিভাগ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদ

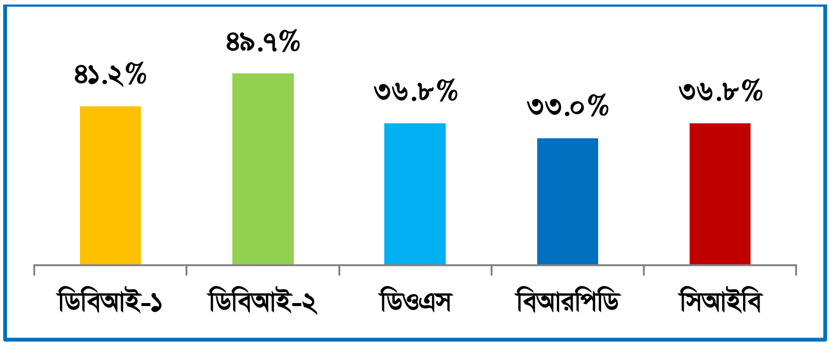

৫.২.২ অনসাইট তদারকির চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পর্কিত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা সামগ্রিকভাবে পরিদর্শন কার্যক্রমকে মন্থর করছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত ও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে-

দায়িত্ব-অর্পনের (delegation) ক্ষেত্রে সংকোচনমূলক নীতি: উপ পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালকদের নের্তৃত্বে সাধারণত পরিদর্শন কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়। দুই বছর পূর্বেও পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তারা সরাসরি কোনো ব্যাংকে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলেও বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (ডেপুটি গভর্নর) পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যাংক পরিদর্শন করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে পরিদর্শন বিষয়ে সল্পতম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিদর্শন দলের ক্ষমতা হ্রাস: অন সাইট সুপারভিশন নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোনো শাখা পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ঋণ বিষয়ক কোনো অনিয়ম চিত্র পেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণিকৃত বা খেলাপি করতে পারতো। কিন্তু ২০১৭ সালের ২৪ জুলাই নীতিমালায় নতুন করে তিনটি বিষয় যুক্ত করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে পরিদর্শন চলাকালে কোনো ঋণ হিসাব গুণগত মানের ভিত্তিতে বিরূপভাবে শ্রেণিকরণের বিষয়ে কমপক্ষে বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের অনুমোদন নিতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক ও ডেপুটি গভর্নরকে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো শাখা অফিস এমন কার্যক্রম চালালে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। এ ছাড়া কোনো ব্যাংক পরিদর্শক দলের আপত্তির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ডেপুটি গভর্নর পর্যন্ত অনুমোদন নিতে হবে। ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে কি না, তা পরিদর্শন করতে ডেপুটি গভর্নর পর্যন্ত অবহিত করতে হবে।[৯৫] পরিদর্শন দলের ক্ষমতা হ্রাস করে ডেপুটি গভর্নরের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম শিথিল হয়ে পড়েছে। ঋণের অনিয়মের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও তার তুলনায় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা বা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাড়ানো যাচ্ছে না। ডেপুটি গভর্নরের একার পক্ষে সারা দেশের আট হাজার শাখার ঋণের তদারকি পর্যালোচনা সাপেক্ষে অনুমোদন করাও সম্ভব নয়। ফলে অনিয়ম আরও বেড়ে গেছে।

পরিদর্শন সময়কাল ও পরিদর্শন দলে জনবল স্বল্পতা: একটি শাখায় নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ন্যুনতম ১০-১৫ দিন প্রয়োজন হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন জন কর্মকর্তার একটি পরিদর্শন দল কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় তিন থেকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ করে থাকে। ফলে নগন্য সংখ্যক নমুনা বাছাই করে নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়। সাধারণত ঐ ব্যাংকের সকল কার্যক্রমের ১০ শতাংশ পরিমাণ কার্যক্রমকে নমুনা হিসেবে নিয়ে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন হয়। যার কারণে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা অনুদঘাটিত থেকে যায়। এছাড়া ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কোনো দলিল বা তথ্য উপাত্ত চাইলে তা সাথে সাথে দেওয়া যাবে না। তথ্য উপাত্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছেকৃতভাবে বিলম্ব করতে হবে। যাতে এই অল্প সময়ে সব কিছু পরিদর্শন করা সম্ভব না হয়। এছাড়া এই তিন চার দিনের পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রথম দিনে পরিদর্শন দলকে আপ্যায়ন করতেই দিনের অর্ধেক সময় অপচয় করা হয়। ফলে পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত সময়টুকুও যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় বিষয়গুলো না দেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো নিয়ে সময়ক্ষেপন করে। যেমন, তারা ব্যাংকে এসে ঋণ ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে কাজ করছে কি না এ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ গভীর পর্যালোচনা না করে কয়টা কয়েন আছে, টাকা গণনার যন্ত্র ঠিক আছে কি না এগুলো দেখে।

[৯৫] দৈনিক প্রথম আলো, কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ক্ষমতায় লাগাম টানলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/

পরিদর্শন প্রতিবেদনে বিলম্ব: পরিদর্শক দল তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদানের পরে উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ তা বিশ্লেষণের পরে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে সুপারিশ করে তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পাঠিয়ে থাকেন। পূর্বে পরিদর্শন দল প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে চুড়ান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান করতো। কিন্তু বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নের এই প্রক্রিয়ার কারণেও ব্যাংকগুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হয়।

পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাস: বাংলাদেশ ব্যাংক তিন ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে-

- নিবিড়/নিয়মিত/প্রথাগত পরিদর্শন
- ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন
- বিশেষ পরিদর্শন/আকস্মাৎ পরিদর্শন।

বাংলাদেশে ব্যাংকের সংখ্যা এবং ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত উল্লিখিত পরিদর্শন কার্যক্রমের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশে ৪৫ টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল সাত হাজার ছয় শত ৫১টি সেখানে পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল দুই হাজার চারশত ৯০টি পক্ষান্তরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৮৬২৯টি কিন্তু পরিদর্শনের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১৯১৭টি।

সারণী ৩: অনসাইট সুপারভিশন কর্তৃক ব্যাংক পরিদর্শন সংখ্যা[৯৬]

অর্থ বছর	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট পরিদর্শন সংখ্যা
২০১৪-১৫	৪৫	৭৬৫১	২৪৯০টি
২০১৫-১৬	৪৫	৭৯৭১	২৭৮৩ টি
২০১৬-১৭	৪৬	৮২৪২	২৪১৩ টি
২০১৭-১৮	৪৬	৮৬২৯	১৯১৭ টি

৫.২.৩ অফ-সাইট তদারকির চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত এবং বিভিন্ন ধরনের দলিল ও প্রতিবেদন সংগ্রহ করে থাকে। তফসিলি ব্যাংকের ঋণ/অগ্রিম আমানত, ঋণ প্রবৃদ্ধি, আমানত প্রবৃদ্ধি, ঋণ/অগ্রিম-আমনত হার, ব্যাংক সমূহের আন্তঃশাখা লেনদেন, মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী, বৃহদাঙ্ক ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী, একক বৃহত্তম ঋণসীমা অতিক্রমে অনাপত্তি প্রদানকৃত ঋণসমূহের হালনাগাদ অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণী, পুনঃগঠিত বৃহদাঙ্ক ঋণ মনিটরিং সংক্রান্ত বিবরণী, মোট মেয়াদি এবং তলবী দায় সংক্রান্ত বিবরণী, সংরক্ষিতব্য নগদ জমা এবং সংরক্ষিতব্য বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংক্রান্ত বিবরণী, তফসিলি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষা কমিটির সভার বিবরণী এবং নিরীক্ষা করা হয়েছে এমন আর্থিক বিবরণী ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অফসাইট সুপারভিশন বিভাগে তাদের কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ তিনটি মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকে। এই প্রতিবেদনের অধিকাংশ তথ্য সুনির্দিষ্ট টেমপ্লেটে (র‍্যাশনালাইজড ইনপুট টেমপ্লেট বা আর আই টি ফর্ম) সংগ্রহ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ওয়্যারহাউজে জমা হয়। বাকী তথ্য অনলাইন প্রতিবেদন (সফট কপি) হিসেবে জমা দেওয়া হয়, যেমন, সিআরআর, এসএলআর ইত্যাদি তথ্য। এছাড়া খুব অল্প পরিমাণে দলিল-পত্র প্রেরণ করা হয় (হার্ড কপি), যার মধ্যে রয়েছে সমঝোতা স্মারক সংশ্লিষ্ট নথি, পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী, মেমো ইত্যাদি। ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত এসকল প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে কিছু চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যের গুণগতমানে সমস্যা: উল্লিখিত তথ্য প্রেরণে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তথ্য গোপন করা বা ভুল তথ্য পাঠালেও তা অফ-সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। পরবর্তীতে অনসাইট ব্যাংক পরিদর্শনের সময় এসকল অনিয়ম চিহ্নিত হয়। ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি চিহ্নিত করতে অনেক বিলম্ব হয়।

তথ্য পর্যালোচনায় বিলম্ব: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের কার্যবিবরণী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাঠানো হয়। পরিচালনা পর্ষদের সভার বিবরনী বিশ্লেষণে কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে বা বিস্তারিত তথ্য না থাকলে উক্ত ব্যাংকের সভাগুলোর মিটিং মেমো নিয়ে

[৯৬] ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে শুরু করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুধুমাত্র ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এবং ২ এর পরিদর্শন সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। যে বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিদর্শন করে থাকে।

আসা হয় এবং সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়। তবে এই বিভাগের জনবলের ঘাটতির কারণে সকল তফসিলি ব্যাংকের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

পর্যবেক্ষকদের কার্যকর ভূমিকায় ঘাটতি: ব্যাংক ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করা, আমানতকারীদের আস্থা বজায় রাখা, আর্থিক সূচকের ব্যাপক ক্রমাবনতি রোধ এবং ঋণ অনুমোদন ও নবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রুডেনশিয়াল প্রবিধান পরিপালনে নিবিড় তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে দেশের তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যাংকসমূহের আর্থিক সূচকে এবং সুশাসনে উন্নতি পরিলক্ষিত হলে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হলে এবং ক্যামেলস রেটিং সন্তোষজনক হলে ব্যাংকগুলো থেকে পর্যবেক্ষক প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগ ২০১৯ সালে ১৪টি ব্যাংকে একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। পর্যবেক্ষক হিসেবে মহাব্যবস্থাপক বা নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পর্যক্ষেকদের নামমাত্র পর্যবেক্ষণ হয়। ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোনো বক্তব্য বা মতামত দেওয়ার সুযোগ হয় না, তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র বোর্ড সভায় উপস্থিতি থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া ব্যাংকের পরিচালক/উদ্যোক্তরা পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে দেখে যে তাদের কি ধরনের চাহিদা আছে এবং সেই অনুসারে তাদের নানা ধরনের সুবিধার প্রস্তাব দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

৫.২.৪ খেলাপি ঋণ চিহ্নিত করতে চ্যালেঞ্জ

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ১৭(১) ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক পরিচালক অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করলে যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন ওই ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত খেলাপি পরিচালককে নোটিশ দেবে। নোটিশ দেওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে খেলাপি ব্যক্তি তাঁর ব্যাংকে পরিচালকের পদ হারাবেন। কিন্তু পরিচালকদের ঋণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্ক, যোগসাজশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে নেওয়া হয় বলে এসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা নিতে অনেক ব্যাংক আগ্রহী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে যোগসাজশের কারণে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক খেলাপি ঋণের বিষয়টি ক্রেডিট ইনফর্মেশন ব্যুরোকে যথাসময়ে প্রেরণ করে না। ফলে বিপুল সংখ্যক ঋণ খেলাপি হিসেবে প্রদর্শিত হয় না।

৫.২.৫ তদন্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট তদারকি এবং অনসাইট পরিদর্শন কাজের পরবর্তীতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ধাপে ধাপে অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষণীয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সত্যিকার বিশ্লেষণভিত্তিক অভ্যন্তরীন মূল্যায়ণ গৃহীত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নিজের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন না করে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যের (বিশেষত অর্থ মন্ত্রণালয়ের) মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। জনতা ব্যাংকে এননটেক্স জালিয়াতির ঘটনা ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত হলেও, ২০১৬-১৭ সালে উদঘাটিত হয় যে এক্ষেত্রে একক বৃহত্তম ঋণ সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। জনতা ব্যাংকের যে শাখা থেকে ঐ ঋণ অনুমোদন করা হয় উক্ত শাখা ম্যানেজার পদোন্নতি পেয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে এসে উক্ত জালিয়াতির সাথে তার সম্পৃক্ততা উদঘাটিত হলেও এখনও তাকে অপসারণ করা হয়নি। দীর্ঘ সময় পার হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

সাময়িক সমাধানের প্রবণতা: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই তার সময়কালে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সফলতা দেখানোর চেষ্টা করে। ফলে সমস্যার কারণ খুঁজে সেটা সমাধান না করে আপাততঃ/তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাটির সাময়িক সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে কী প্রভাব পড়বে সেটা গুরুত্ব না দিয়ে, প্রায় সবাই নিজের সাফল্য দেখাতে সাময়িক সমাধানে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে, সাম্প্রতিক সময়ে খেলাপি ঋণ আপাতদৃষ্টিতে কম দেখানোর জন্য খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা পরিবর্তন, এককালীন এক্সিট, ঋণ অবলোপন ইত্যাদি নীতি গ্রহণ বা সংশোধন করা হয়।

৫.৩ তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং তদারকি সক্ষমতা ঘাটতির পাশাপাশি তদারকি কাজে অনিয়ম-দুর্নীতিও লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক চাপে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা এই অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত করে থাকে অথবা কখনও কখনও তারা সুবিধা লাভের মাধ্যমেও এই অনিয়ম-দুর্নীতি করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে-

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা: অনেকসময় "আর্থিকখাতের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে" এই অজুহাতে নিরাপত্তা সঞ্চিতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা ঋণ শ্রেণিকরণে অনিয়ম উপেক্ষা করা হয়, বিষয়গুলো দালিলিকরণ (documentation) না করে শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম উদঘাটনে সক্ষমতা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

প্রকৃত তথ্য আড়াল করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন (আন্ডার রিপোর্টিং): তদারকিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের একাংশ আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে কিছু তথ্য গোপন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন করে থাকে।

তদারকি প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরবর্তীতে বাদ দেওয়া: কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনসাইট পরিদর্শনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত কিছু অনিয়ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে যে, একটি বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর অনিয়মের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এই ধরনের কাজ করে থাকে। প্রতিবেদনে অসন্তোষজনক বিষয়গুলো খসড়া প্রতিবেদনে থাকলেও চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে সেই সকল বিষয় বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। একটি বিভাগের কর্মকর্তাদের পক্ষে এটির প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না, কারণ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক বার্ষিক মূল্যায়নে শতকরা ৯০ ভাগ নাম্বার না পেলে পদোন্নতি হয় না। ফলে তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাজের প্রতিবাদ করে তাদের পদোন্নতির পথে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে চায় না।

> "খেলাপী ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অবগতিতেই আন্ডার রিপোর্টিং হয়ে থাকে। একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের খেলাপী ঋণের চিত্র অফিসিয়াল চিত্রের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী। কিন্তু প্রকৃত চিত্র অফিসিয়ালি দেখানো সম্ভব না। যদি দেখানো হয় তাহলে ব্যাংকটি বসে পড়তে পারে। ফলে আরও অনেক ব্যাংক বসে পড়বে।"
> **- একজন মুখ্য তথ্যদাতা**

প্রতিবেদন গোপন করা: বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ব্যাংক পরিদর্শনের পর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদনগুলো অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে আসে। কিন্তু পরবর্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার করার পরিবর্তে সেগুলো দীর্ঘদিন ফেলে রাখে। একজন মুখ্য তথ্যদাতা বলেন, "সেগুলো ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যায়"।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে অবহেলা: দুর্বল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী পর্যায় সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের প্রাপ্ত ক্ষমতার চর্চা না করে তোষণ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় সরকারি মর্জি মেনে নেয়। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের মেয়াদ শেষে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের নিয়োগের আশায় সরকারের সুদৃষ্টিতে থাকার জন্য প্রভাবশালীদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করতে চায় না। তারা নিজেরা কোনো ব্যবস্থা নিতে চায় না এবং অন্যদের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুনজরে থাকার জন্য কর্মকর্তাগণ অনৈতিক আরোপিত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা মেনে নেয়।

আবর্তমান দ্বার (revolving door) কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকে অবসর নেওয়ার পরপরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতেন সেখানে উচ্চ পদে যোগদান করেন। চাকুরিকালীন সময়েই তাদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমের একজন সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং সাবেক একজন ডেপুটি গভর্নর অবসর নেওয়ার পরপরই দুইটি মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বড় বড় কর্মকর্তাদের এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং পরিদর্শন বিভাগের ছোট কর্মকর্তাদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে হৃদ্যতা/ স্বজনপ্রীতি: বেসরকারি ব্যাংকসমূহের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের একাংশ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা অবসরের পর একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম মোকাবেলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তবে পরিদর্শন, নিরীক্ষার আওতা, টেকনিক্যাল সক্ষমতা এবং সততার ক্ষেত্রে গত দুই বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের তাদরকি কার্যক্রম কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে সম্প্রতি পরিদর্শন কাজে সরাসরি আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৫.৪ তদারকি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

বিশ্বব্যাপি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু একটি স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে জবাবহিদিতা অন্যতম মূল চাবিকাঠি। একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তার প্রাপ্ত ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার করছে সে বিষয়ে জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। তিনভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়-

১. **বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ:** সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাইরে খাত সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির উপস্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে

২. **সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহিতা:** নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট জবাবদিহিতা অর্থে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা

৩. **তথ্যের উন্মুক্ততা:** তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সর্ব সাধারণের কাছে জবাবদিহিতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গবেষণাগুলোতে যে ধরনের সূচক ব্যবহার করা হয় তার আলোকে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিন ধরনের জবাবদিহি প্রক্রিয়াতেই ঘাটতি লক্ষ করা যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত লক্ষ করা যায় যা ব্যাংকিং খাত তদারকি প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সীমিত ভূমিকা: আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও অনুকরণীয় চর্চায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজের জবাবদিহিতা কাঠামোর একটি অন্যতম ক্ষেত্র হতে পারতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা মূলতঃ প্রশাসনিক (যেমন, নতুন বিভাগ অনুমোদন) ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত (বাজেট অনুমোদন) গ্রহণের মধ্যে সীমিত। দশ লক্ষ টাকার অধিক খরচের প্রয়োজন হলে, বাংলাদেশ ব্যাংককে বাধ্যতামূলকভাবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিতে হয়। ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সৌজন্যতাবশত ও আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে পর্ষদ সভায় অন্তবর্তীকালীন সময়ের প্রতিবেদন, কার্যবিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সরকার গঠন করে দেয়। এর সদস্যদের মধ্যে সরকারি প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেশি (বর্তমান ও সাবেক আমলা মিলিয়ে পাঁচ জন)। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের তিনজন সচিব থাকার ফলে এই পর্ষদ অনেক বেশি আমলা নির্ভর। ফলে সরকারের নির্বাহী বিভাগের মতামত বা হস্তক্ষেপের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অন্য সদস্যগণও সরকারের পছন্দ মোতাবেক নিযুক্ত হওয়ার ফলে এই পর্ষদ একটি স্বাধীন জবাবদিহি কাঠামোর অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া সরকার কর্তৃক চারজন মনোনিত সদস্য রাখার কথা থাকলেও বর্তমানে তিন জন রাখা হয়েছে। যার ফলে পর্ষদের ভুমিকা আরও সীমিত হয়েছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহিতায় ঘাটতি:[৯৭] সংসদের কাছে জবাবদিহিতা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কাঠামোর একটি কার্যকরী অংশ হতে পারতো। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর ৩৮A ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংককে বছরে ন্যূনতম একবার বা যে কোনো প্রয়োজনে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির আহবানে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে মুদ্রানীতি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা এবং প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও, মন্ত্রী-সাংসদসহ বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি ব্যাংকিং খাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে এই জবাবদিহি কাঠামো কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ধারা ১৮৮(২) অনুযায়ী, এমন কোন সদস্য সংসদীয় কমিটিতে নিযুক্ত হবেন না, যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। এক্ষেত্রে স্বার্থ বলতে সদস্যের প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ বোঝাবে এবং যার অন্তর্ভুক্তি সাধারণভাবে জনস্বার্থের অনুকূলে নয়, অথবা কোনো শ্রেণি বিশেষ অথবা তার অংশের পরিপন্থী।[৯৮] কিন্তু বিগত তিনটি সংসদের এই সংসদীয় কমিটিগুলোতে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একটি কমিটি একটি বৃহৎ ঋণ কেলেঙ্কারী বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করলেও তা প্রকাশে সভাপতি অনীহা প্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন কমিটির আলোচ্য সূচিতেও রাখা হয় নি।[৯৯] এছাড়া ঋণ বিতরণে অনিয়মের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পদক্ষেপের চার দিন পর সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক কর্মকাণ্ডের ওপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করে তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন করতে বলে।[১০০]

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের কারণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশে ঘাটতি: ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জবাদিহিতা নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। যেখানে ব্যাংকিং খাতের কিছু সার্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা, নীতি গ্রহণের কারণ, অন্যান্য নীতির উপর এই সকল নীতির সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভার সদস্যদের ভোট সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা তথ্যের উন্মুক্ততা বিষয়ে যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষণীয়। এই সকল ঘাটতির ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সিদ্ধান্ত কিছু ব্যবসায়ী গ্রুপের অনুকূলে যায় এবং আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থি হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য/গভর্নর/ডেপুটি গভর্নর নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের (পর্ষদ সদস্য বা গভর্নর) নিয়োগ প্রক্রিয়া, মেয়াদকাল, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, দ্বায়িত্বের পরিধি কি হবে, এগুলো সুস্পষ্টভাবে লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু এই ধরনের নিয়োগের কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ইত্যাদি নীতি নির্ধারনী পদসমূহে নিয়োগের সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ হওয়া এই ঘাটতির কারণ।

---

[৯৭] বাংলাপিডিয়া, বিস্তারিত দেখুন: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=সংসদীয়কমিটি

[৯৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, ধারা ১৮৮(২), পৃষ্ঠা ৫৩, বিস্তারিত দেখুন: http://www.parliament.gov.bd/images/pdf/Rules_of_Procedure_Bangla.pdf ,পরিদর্শন তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

[৯৯] দৈনিক প্রথম আলো, তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে না সংসদীয় কমিটি, ১৭ মে ২০১৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[১০০] দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরীক্ষা চায় সংসদীয় কমিটি, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: সকল ধরনের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা "আর্থিক খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে" নির্বিচারে এই অজুহাত দেখানো হয়। ফলে ঋণ খেলাপি ও ব্যাংকের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেরিত তিনশত ঋণ খেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই তিনশত প্রতিষ্ঠানের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়েছে এবং খেলাপি হয়েছে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া যারা একাধিকবার রাজনৈতিক বিচেনায় ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ করে পুণরায় ঋণ খেলাপি হয়েছে তাদের নামও কখনও প্রকাশ করা হয় না। বর্তমান গবেষণার জন্য একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদান করেনি। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার পরও তথ্য না দেয়ায় তথ্য কমিশনে আপীল করা হয়। তারপরেও নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আংশিকভাবে তথ্য প্রদান করা হয়।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিরাজমান। সদিচ্ছার ঘাটতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে বিদ্যমান আইন যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই প্রাপ্ত ক্ষমতা চর্চা না করে স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে এই ক্ষমতা প্রয়োগের নজির রয়েছে। নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণেও ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবনমন ঘটেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:
উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, সরকারি নীতি ও কৌশলসমূহে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ইচ্ছায় সরকার কর্তৃক তাদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে অন্য দিকে আইনগত বাধা, সচ্ছিার ঘাটতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এর প্রাপ্ত ক্ষমতা চর্চা করতে না পারা, তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন ঘটেছে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মাধ্যমে কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব করেছে এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে যা নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। এসকল কারণে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতে বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চরম মূলধন সংকট তৈরি করেছে। এই সংকট কাটাতে প্রতি বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে জনগণের করের টাকা থেকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কিছু মানুষের অনিয়ম-দুর্নীতির বোঝা ক্রমাগতভাবে জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে। খেলাপি ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও বিদেশে পাচার, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাকে ব্যাহত করছে।

৬.২ সুপারিশ

ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সুস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েম করতে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো-

সার্বিক

১. ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে, যেখানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে

প্রাসঙ্গিক আইনের সংশোধন সংক্রান্ত

২. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে

৩. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৫৮ ও ৭৭ ধারা সংশোধন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীদের ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ এবং ব্যাংক-কোম্পানীর পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে

৪. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র কায়েমে সহায়ক এমন সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- একই পরিবারের একাধিক সদস্য ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবে না
- পরিচালক পদে একাদিক্রমে নয় বছর মেয়াদে নিয়োগের বিদ্যমান বিধান বাতিল করতে হবে। পরিচালক পদের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ তিন বছর এবং মেয়াদ শেষে তিন বছর বিরতি সাপেক্ষে পুণঃনিয়োগ করা যাবে
- পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে ১৩ জন করতে হবে এবং যার এক তৃতীয়াংশ হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত আমানতকারীদের প্রতিনিধি

৫. ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপির সংজ্ঞা ও শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে

৬. সমগ্র ব্যাংকিং খাত থেকে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণ সীমা নির্ধারণ করতে হবে

৭. রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধান করতে হবে

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ এর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পরিচালক নিয়োগের বিধান ব্যাংক কোম্পানী আইনের পরিচালক নিয়োগের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ সংক্রান্ত

৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালানা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা তৈরি করতে হবে যেখানে অনুসন্ধান কমিটির গঠন এবং দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে

১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসন বিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে

১১. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে

প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন ও ব্যাংকিং নীতি সংশোধন সংক্রান্ত

১২. আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে

১৩. ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ সর্বদা বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ নজরদারীর মাধ্যমে অনুমোদন করার ব্যবস্থা রাখতে হবে

১৪. আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন সকল নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণিকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত

১৫. সংসদের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মুক্ত অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ত, এর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্ষদের ভোট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে

১৭. বাংলাদেশে ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে

১৮. বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সংক্রান্ত

১৯. ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগসমূহের শূন্য পদসমূহ পূরণ করতে হবে

২০. ব্যাংক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে

২১. পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তাবায়ন করতে হবে

২২. তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

পরিশিষ্ট-১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Abigail J. Marcus, Central bank governance and the prevention and detection of corruption, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, Date: 4 April 2019

২. Banerjee, P.K., Karmaker, D.R., Pandit, A.C., Hossain, M.M., Rahman, T., Faisal, N.A. and Azam, M.T. (2015). "Credit Operations of Banks – 2014", *Banking Review Series 2015*, Paper 1, pp. 01-58, BIBM, Dhaka.

৩. Barun Kumar Dey, Managing Nonperforming Loans in Bangladesh, Asian Development Bank, 2019

৪. Basel committee on Banking Supervision, Core Principles for effective banking supervision (Version effective as of 15 Dec 2019), (2019), Bank for International Settlements,

৫. Dr. Shah Md. Ahsan Habib and Md. Mohiuddin Siddique, A Review of the Supervisory initiatives by Bangladesh Bank, Bangladesh Institute of Bank Management; 1st edition (2014)

৬. Dr. Moinul Islam and Mohiuddin Siddique, A Profile of Bank Loan Default in the Private Sector in Bangladesh, 2010, Chittagong, Bangladesh

৭. Fahmida Khatun, State governance in the Banking Sector; dealing with the recent shocks, State of the Bangladesh Economy in FY 2011-2012, CPD, 2012

৮. Fahmida Khatun, Banking sector in Bangladesh: Moving from Diagnosis to Action, CPD

৯. Florin Cornel DUMITER, Central Bank Independence, Transparency And Accountability Indexes: A Survey, *Timisoara Journal of Economics and Business, ISSN: 2286-0991, www.tjeb.ro*, Year 2014, Volume 7, Issue 1

১০. Imtiaz Ahmad Masum, An Anatomy of Central Bank's Supervisory Functions with Special Reference to Bangladesh Bank, Asian Institute of Technology School of Management, Thailand, May 2012

১১. IMF, Press Release on Article IV Consultation with Bangladesh, 2019,

১২. Marc Quintyn, Michael W. Taylor, Should Financial Sector Regulators Be Independent? International Monetary Fund, Working Paper WP/02/46, March 8, 2004

১৩. Md. Abdul Awwal Sarker et el. "Field Survey Report of Study on Credit Risk arising in the Banks from Loans Sanctioned against Inadequate Collateral", Bangladesh Bank, 29 August 2017

১৪. Quarterly Financial Stability Assessment Report, Bangladesh Bank, July-September, 2019

১৫. বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, ২০০৯

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, ইস্যু: ১৮, ২০১৯ (II), এপ্রিল-জুন, ২০১৯

১৭. বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, ২০১৮

১৮. বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, ২০১৯

১৯. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ২০১২

২১. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট,

২২. ফারুক মঈনউদ্দীন, 'ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি ও সুবোধ ঋণগ্রহীতা', দৈনিক প্রথম আলো, ০৭ জুলাই ২০১৯

২৩. বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫. বাংলাদেশ ব্যাংক'স (ন্যাশনালাইজেশান) অর্ডার, ১৯৭২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬. নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক অ্যাক্ট, ২০০২, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, উৎস: https://www.nrb.org.np/category/acts/?department=lgd

২৭. মানিটারি ল অ্যাক্ট, ১৯৪৯, সেন্ট্রল ব্যাংক অব শ্রীলংকা, উৎস:
https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/acts/legislative-enactments
২৮. রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৪, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট, উৎস:
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIA1934170510.PDF
২৯. রিজার্ভ ব্যাংক অভ ইন্ডিয়া, Master circular on willful defaulter, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ১ জুলাই, ২০১৫